জীবনের বিন্দু বিন্দু
গল্প
মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ।

শিক্ষক পিতা ও গৃহিনী মায়ের চতুর্থ সন্তান। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে জন্ম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাহাড়ঘেরা পার্বত্য জনপদে। বনবাদাড়ের ভয়জাগানো আদিম আবহাওয়ায়। স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদীর বিক্ষুব্ধ স্রোতে সাঁতার খেলে। বহু উপজাতির নানাবিধ বৈচিত্র্যময় সমাজে। পিত্রালয় ও মাতুলালয় ফেনীর ভাবগম্ভীর ধর্মীয় আবহে।

পড়াশোনার সূত্রে সময় কেটেছে গ্রামবাঙলার নিটোল পল্লীর গ্রামীণ পরিবেশে। প্রাচীন ধারার কওমী মাদরাসার আমলি পরিবেশে।

পড়াশোনার হাতেখড়ি বাবা ও মায়ের কাছে। মাদরাসাজীবন কেটেছে, মামা মাওলানা সাইফুদ্দীন কাসেমী (দা বা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তিনি হাকীমুল উম্মতের অন্যতম প্রধান খলীফা মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.-এর খাস সোহবতপ্রাপ্ত। ফেনীর ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাদানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম।

ফলে মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ বেড়ে উঠেছেন খানকাহী মেজাজে, সুনিপুণ তরবিয়তের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে দাওয়াত, তালীম, জিহাদ ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

নব্বইয়ের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসক ও শান্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্যে সৃষ্ট হওয়া টানটান উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, তার মনমননে গভীর রেখাপাত করেছে। পাশাপাশি এই দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, আফগান জিহাদ তাকে দিয়েছে ভিন্নধর্মী এক চেতনা। বিশ্ব রাজনীতি ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তার আছে গভীর পাঠ।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া থেকে তিনি তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) সমাপ্ত করেছেন। কুরআনের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম প্রতিষ্ঠা করে। যার অন্যতম লক্ষ্য কুরআনের আলোয় আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ। মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ স্বভাবগতভাবে নিভৃতচারী হলেও কাছের মানুষরা জানে তিনি বেশ রসিক মানুষ। বই পড়া তার পেশা ও নেশা। অনলাইনে পঞ্চাশেরও অধিক শিরোনামে ধারাবাহিক লেখা লিখে চলছেন বিরামহীনভাবে।

তার লিখিত জীবন জাগার গল্প সিরিজের লেখাগুলো বেশ সুখপাঠ্য। পাঠক অবচেতনমনেই আকৃষ্ট হয় কুরআনের প্রতি। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর লেখাগুলো আমাদেরকে জাগিয়ে তোলে গাফলাতের সুখনিদ্রা থেকে। উদ্বুদ্ধ করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে। আল্লাহ তাঁর কলমকে আরও শাণিত করুন। গোটা বিশ্বকে কুরআনি আলোয় আলোকিত করুন।

—প্রকাশক
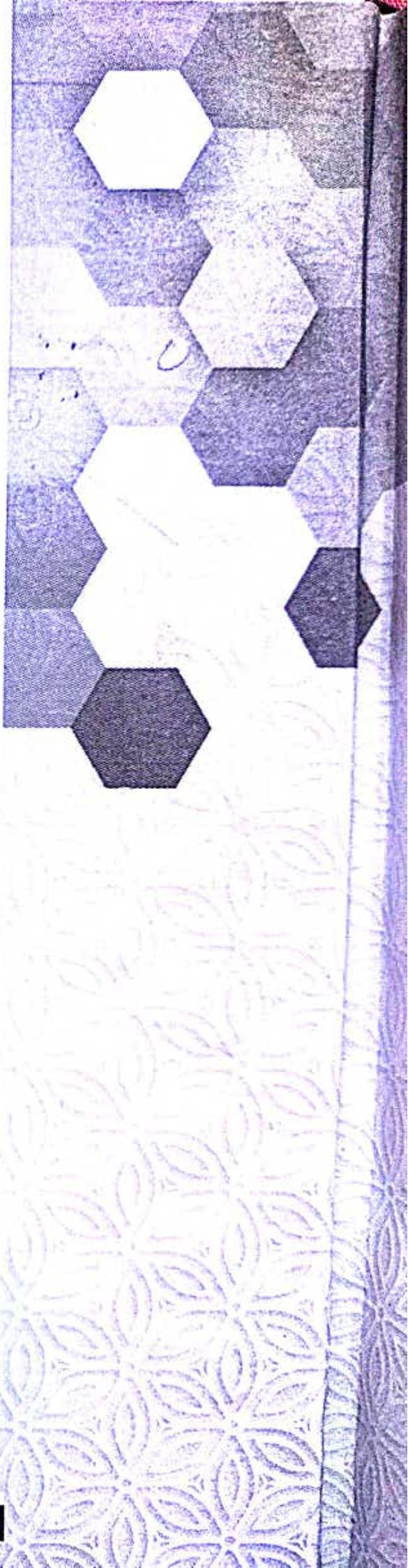
জীবনের বিন্দু বিন্দু গল্প

[জীবন জাগার গল্প-৩]

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

শিক্ষক

তারজামাতু মা'আনিল কুরআনিল কারীম

সীরাত, ইতিহাস

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

শ্যামলী, ঢাকা

গল্পসূচি

শুরুর কথা

আমরা গল্প বলার ধাঁচটাকে নতুন করে সাজাতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আমাদের অযোগ্যতার কারণে পেরে উঠছি না। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দুর্বলতাগুলো পর্যালোচনা করে দেখছি। আল্লাহ্ তাওফিক দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্।

গল্পের মধ্য দিয়ে একটা বক্তব্য তুলে ধরা বেশ কঠিন। বিশেষ করে নৈতিকতার বিষয়টি তুলে ধরা। বেশি জোরাজুরি করলে কৃত্রিমতা চলে আসে; আবার লাগাম ছেড়ে দিলে বক্তব্যের গাঁথুনির ঠাসবুনট আলগা হয়ে যায়। উভয় দিক সামাল দেওয়া এক দুরূহ কর্ম।

সুযোগ পেলেই খুঁজতে থাকি, আশপাশে গল্পের কোনো উপাদান পাওয়া যায় কি-না। আগে শুনিনি এমন কিছু কানে আসে কি-না! কিন্তু আমরা দেখেছি, গল্প পাওয়া গেলেও সেটা ঠিক সবার সামনে উপস্থাপনযোগ্য হয় না। তেমন গল্প পেতে হলে কলব সাফ থাকতে হয়। চিন্তাটা পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। চেতনাটা সজাগ রাখতে হয়।

সেদিন একজন জানতে চাইল, 'গল্পগুলো কোত্থেকে সংগ্রহ করেন?'

– কেন, বিভিন্ন কিতাব পড়ে, পত্র-পত্রিকা পড়ে!

– কোথায় পড়েছেন, উৎস বলে দিলে গল্পটা আরো বিশ্বাসযোগ্য হত না!

– আরে ভাই! আমি তো ইতিহাস বলতে বসিনি। তথ্যবহুল গবেষণাও জমা দিতে বসিনি। আমি বসেছি কিছু কথা বলতে। কিছু ব্যথার লেনদেন করতে। কিছু অনুভূতিকে প্রকাশ করতে। কিছু আবেগকে পরিস্ফুট করতে। কিছু চিন্তা ছড়িয়ে দিতে।

একজন অন্য ঘরানার মানুষ। তিনি বিশ্বাস ও আকিদাগত দিক থেকে আমাকে ও আমাদের এই গল্পগুলো পছন্দ করার কথা নয়; কিন্তু এক ভাই এসে জানাল, "আপনার গল্পগুলো 'উনি' পছন্দ করেছেন।"

ভাবতে বসলাম, কেন উনার কিছু গল্প পছন্দ হল? একি আমাদের কৃতিত্ব? না, নির্মোহ বিশ্লেষণে গেলে বোঝা যায়, এটা মোটেও আমাদের কৃতিত্ব নয়। এটা গল্পের কৃতিত্ব। আর গল্পগুলো তো নিখাদ আমাদের বানানো নয়। বিভিন্ন স্থান থেকে ধার করা!

আমাদের এ গল্পের বইয়ে কেউ সাহিত্যমান বিচার করতে গেলে, তাকে হতাশ হতেই হবে। আমরা সাহিত্যচর্চা করার জন্য এ বই তৈরি করিনি।

– তো কেন?

— আমরা চেয়েছি কোনো রকমে গল্পের মাধ্যমে একটা বক্তব্য পৌঁছে দিতে। তবে হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতে আপত্তি নেই, গল্পগুলো আরো ভালোভাবে বলা যেতো, আমাদের অযোগ্যতার কারণে আমরা তা পারিনি। এ দায় আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ করছি। বইয়ের অন্য কোন দিকের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, শুধু ভালো লাগা গল্পগুলোর দিকেই তাকানোর করজোড় অনুরোধ রইল।

আমরা আশপাশের প্রভাবে, কিছু ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাই। কিছু চিন্তার নিগড়ে বন্দী হই। কিছু রীতি-নীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাই। কিছু প্রথা-প্রচলনের সঙ্গে জুড়ে যাই। যদি ভালো কিছুর সঙ্গে লেগে থাকি, সেটা আল্লাহর অশেষ কৃপা। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে সারা জীবন তার কুপ্রভাবের ঘানি টেনে যেতে হয়।

কিছু গল্প এদিক-সেদিক হল। নতুন কয়েকটা গল্প গাঁথা হল। কিছু অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছিল, সেগুলো সংশোধন করা হল। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অসংখ্য ভুল থেকে গেল। অভিজ্ঞ কোনো ভাই ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন, এই প্রত্যাশা! আমাদের একান্ত কামনা—বইয়ের কোনো কোনো গল্প আমাদের সেই অভ্যস্ত জীবনে একটু হলেও তরঙ্গ সৃষ্টি করবে, সামান্য হলেও দোলা দেবে, একটু হলেও ঢেউ তুলবে।

একটা ভালো লেখা বা ভালো গল্প পড়া মানে ভালো একজন মানুষের সঙ্গে কিছু সময় কাটানো। একটা সুন্দর গল্প পড়া মানে নিজের মনে একটা নতুন পকেট বা খোপ তৈরি হওয়া। এ পকেটে থাকে গল্পের স্মৃতি, গল্পের শিক্ষা, গল্পের ভাব। যে গল্প যত শক্তিশালী তার পকেটও তত স্থায়ী।

রাব্বে কারীম সবাইকে কবুল করুন।

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

স্টার অব ডেভিড

মুহাম্মাদ জাওলানি। লিবিয়ান যুবক। ত্রিপোলি ইউনিভার্সিটির ছাত্র। কলেজ জীবন থেকেই বাম রাজনীতিতে অভ্যস্ত। বামঘেঁষা হলেও আল মুআম্মার গাদ্দাফির সবুজ বিপ্লবের কড়া সমালোচক। লকারবি বিমান হামলার আগে, বিশেষ একটা বৃত্তিতে জাওলানির হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হল।

দেশে থাকতেই উশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও, ধার্মিক মা-বাবার বাধার মুখে কিছুটা লাগাম ছিল। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কারণেই, ছোটবেলায় কুরআন কারীম ভালোভাবে শিখতে হয়েছিল। শত পাপ করলেও কুরআন কারীমের প্রতি একটা সুপ্ত দুর্বলতা ছিল। তার উদ্দাম জীবনের পথে, কুরআনের প্রভাবে মনে একটা কাঁটা সারাক্ষণ খচখচ করে বিঁধত।

এখন হার্ভার্ডে এসে আর কোন বাধা রইল না। রইল না অপরাধবোধের আড়। একদম লাগাম ছাড়া হয়ে গেল। রাত কাটতে লাগলো নাইটক্লাবে আর দিন কাটতে লাগলো বিছানায় ঘুমিয়ে। কখনো কখনো টুকটাক ক্লাসে হাজিরা দিয়ে।

কিছুদিন পর তার থাকার রুমটাও পাপের আখড়া হয়ে গেল। নানারকমের মেয়ের অভয়ারণ্যে পরিণত হল তার ছোট্ট গৃহকোণ। এরপরের ঘটনা মুহাম্মাদের মুখেই শোনা যাক।

আমার জীবনটা এভাবেই কেটে যাচ্ছিল। দিনদিন পাপের মান-পরিমাণ বেড়েই চলছিল। এক রাতে, আমি প্রতিদিনের সেই নাইটক্লাবে গেলাম। গত কয়েকদিন থেকেই দেখছিলাম একটা মেয়ে আমার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। কাছে আসার চেষ্টা করেনি। আমার সঙ্গে কথা বলারও কোন আগ্রহ তার মধ্যে দেখিনি। শুধু আমি যেদিকে নাচতাম মেয়েটাও সেদিকে থাকত।

মেয়েটার অপূর্ব সৌন্দর্যের কারণে সবাই তাকে নাচের সঙ্গী বানাতে চাচ্ছিল। কেন যেন সংকোচের কারণে আমি তার সামনে যেতে পারছিলাম না।

আমার চেহারাটাও অসুন্দর ছিল না। ছোটবেলা থেকেই সবার মুখ থেকে এটা শুনে আসছি। আমেরিকা আসার পরও এটা বুঝতে পেরেছি। আমার বাবা একজন মন্ত্রী। তাই টাকারও অভাব ছিল না।

সে রাতে আমি একটু ক্লান্ত থাকায়, এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে বারের এক কোণে বসেছিলাম। হালকা চুমুকে সময়টা উপভোগ করছিলাম। এমন সময় মেয়েটা আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। অনুমতি নিয়ে বসল। আমি তখন মন্ত্রমুগ্ধ। সবকিছু যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘটছিল। নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

– আমার নাম হানা। তোমার নাম?

– আমার নাম মুহাম্মাদ।

– তোমার নাম মুহাম্মাদ? তার মানে তুমি মুসলিম?!

– কেন কী হয়েছে?

– না, কিছু হয়নি।

মেয়েটার চেহারায় কেমন যেন একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখলাম। মনে হল ঘৃণার একটা রেশ ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। তখন আমি ঘোরের মধ্যে থাকায় অতশত তলিয়ে দেখার মানসিকতা ছিল না। তাকে নাচের আমন্ত্রণ জানালাম। রাজি হল। অনেকক্ষণ নাচলাম আমরা। ঘরে ফেরার সময় তাকেও আমার সঙ্গে ফ্ল্যাটে আসার আহ্বান জানালাম। সে বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল।

আমার এই বাউণ্ডুলে দিনগুলোতে যখন একা হয়ে যেতাম, বিছানায় শোয়ার পর মনে মনে হালকা অনুতাপ হতো। ছেলেবেলায় পড়া কুরআনের কথা মনে হতো। আব্বু-আম্মুর কথা মনে হতো। দাদুর কথা মনে পড়তো। কিন্তু পরদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠলে আর কিছু মনে থাকতো না। বিশেষত 'হানা'র সামনে গেলে দুনিয়া-আখিরাত কিছুই মনে থাকতো না। জীবনটা আস্তে আস্তে হানার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রতি রাতেই তাকে সঙ্গে আসার কথা বললে সে কৌশলে এড়িয়ে যেত।

একদিন তাকে খুব অনুনয়-বিনয় করে বললাম। সে থমকে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি। তবে একটা শর্ত আছে।

– কী শর্ত?

হানা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চেইন বের করল। চেইনটার লকেটে একটা 'স্টার অব ডেভিড' লাগানো ছিল। ইহুদিদের ধর্মীয় প্রতীক। ইসরায়েলের পতাকায় তারার মতো যে লোগোটা থাকে সেটা।

ওটা দেখেই আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। আর্তনাদ করে উঠলাম, হানা তাহলে ইহুদি? এজন্যই সে আমার পিছু নিয়েছে?

এসব কথা মনে মনে ভাবলেও, হানার সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম আমি একজন মুসলমান। ভুলে গেলাম আমি কুরআনের একজন হাফেজ। ভুলে গেলাম আমি একজন আরব। ভুলে গেলাম আমার নামটা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নামে রাখা।

হানার চোখে মিনতি ঝরে পড়ল। সে অনুনয় করে বলল, 'তুমি যদি আমাকে চাও তাহলে এই লকেট তোমাকে গলায় পরতে হবে। তোমার গলায় এই লকেট থাকলে তবেই আমি তোমার ফ্ল্যাটে যাব।'

হানার দেয়া লকেটটা গলায় পরলাম। তার খুশি আর দেখে কে। সে ক্যামেরায় আমার অনেকগুলো ছবি তুলে রাখল। খুশি খুশি গলায় বলল, 'তোমাকে কি যে সুন্দর লাগছে! লকেটটা তোমাকে খুবই মানিয়েছে। তোমার জন্যই বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে লকেটটা বানিয়েছি।'

এই লকেট গলায় পরা না থাকলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

তার সব আবদার আমি মেনে নিয়েছিলাম। সে যা বলত তাই শুনতাম। সে প্রায় প্রতিদিনই আমার ফ্ল্যাটে আসত। নানারকমের খাবার রান্না করে খাওয়াত। তার দাদা-দাদি ইসরায়েলে থাকে। আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবে বলেছে। তার নানি থাকে পোল্যান্ডে। সেখানেও নিয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিল।

কিছুদিন পর, আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। সে বলল, তোমার প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা কাজ করলে সেটা সম্ভব হতে পারে।

– কী সে কাজ? তুমি যা বলবে আমি তাই করতে রাজি।

– তোমাকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি কখনো এমন একটা প্রস্তাবের মুখোমুখি হব। আমি তাকে মোটা অংকের মোহরানার লোভ দেখালাম। লিবিয়াতে বা বিশ্বের যে কোন বড় শহরে রানির হালে থাকার লোভনীয় অফার দিলাম। সে কিছুতেই টললো না। জেদি একগুঁয়ের মতো নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকল। অগত্যা আমি বলতে বাধ্য হলাম: 'আমার পক্ষে ইহুদী হওয়া অসম্ভব।'

সে বলল, 'তুমি ইহুদী না হলে, আমার পক্ষেও তোমাকে বিয়ে করা অসম্ভব। বুঝতে পারছি, তুমি আসলে আমাকে ভালোবাসো না।'

হানার এমন দৃঢ়তায় আমার ইচ্ছা-শক্তি দুর্বল হয়ে গেল। তার প্রতি অন্ধের মত আসক্ত ছিলাম। সে ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাই করতে পারছিলাম না। এভাবে কয়েকদিন টানা-হেঁচড়ার পর আমি হার মানতে বাধ্য হলাম।

হানা সে রাতেই ক্লাব থেকে ফেরার পথে বলল, 'আমি প্রতিদিন তোমার ফ্ল্যাটে যাই। আজ তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে।

– কোথায়?

– একটা সুন্দর জায়গায়।

দুজনে একটা বড়সড় প্রাসাদে গেলাম। বিরাট হলঘরে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল। আমরা প্রবেশ করতেই সবাই আমাদের ঘিরে ধরলো। ঘরের মাঝামাঝিতে একটা বেদি। তার উপর বিরাট একটা মোমদানি। অনেকগুলো মোম একসঙ্গে জ্বালানো। বেদির একপাশে প্রকাণ্ড স্টার অব ডেভিড। হানা কয়েকজনকে ফিসফিস করে কী সব বলল। এবার কয়েকজন কালো পোশাকধারী ব্যক্তি আমাকে শুইয়ে দিল। একজন এসে আমার মাথার চুলগুলো মুড়িয়ে দিল।

আমি কোনো অনুভূতি ছাড়া, কোনো কারণ ছাড়াই কেন যেন কাঁদছিলাম। হানা আমার হাত ধরে সান্তনা দিচ্ছিলো।

যাজকরা আরো কতো কী করল। আমি একটা আবেশের মধ্যে ছিলাম। মনে হল অনেক কাল পরে হানা বলল, 'চলো। বাসায় চলো।'

পরদিন থেকে আমার জীবনের রূপ-রস-গন্ধ সব চলে গেল। খাবারে শান্তি পাচ্ছিলাম না। রাতে ক্লাবে আনন্দ পাচ্ছিলাম না। গ্লাসের পর গ্লাস মদ পান করেও নেশা ধরাতে পারছিলাম না।

এরমধ্যে একদিন আমার ব্যাগ ঘাঁটতে গিয়ে ব্যাগের গোপন কম্পার্টমেন্টে (পকেটে) সুন্দর কাপড়ে মোড়ানো ছোট্ট এক জিলদ কুরআন শরীফ পেলাম। কুরআন কারীম দেখে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম।

বুঝতে পারলাম, লিবিয়া থেকে আসার সময়, আম্মু ব্যাগ গুছিয়ে দিতে গিয়ে আল্লাহর কিতাবও সঙ্গে দিয়েছেন। ব্যাগের কোণে লুকিয়ে দিয়েছেন। পাছে আমি দেখে ফেললে রেখে চলে আসি!

কুরআন কারীম দেখে আমি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লাম। আমার মরহুম দাদু। তিনিই আমার কুরআনের শিক্ষক। তিনি ছিলেন ওমর মুখতারের সঙ্গে ইতালিবিরোধী জিহাদের মুজাহিদ।

দাদু কুরআন শিখেছেন সানুসি আন্দোলনের এক বড় শায়খের কাছে। দাদু সানুসি তরীকার মুর্শিদও ছিলেন। আমার যে বছর হিফজ শেষ হল, দাদু আমাকে এই জিলদখানা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার ছোট্ট ভাইয়া, গতবছর হজে গিয়ে, তোমার জন্য এক জিলদ কুরআন এনেছিলাম। কাবার গিলাফ ছুঁয়ে, জমজমের পানি লাগিয়ে, নবীজির রওজা মুবারকে দুআ করে এই কুরআন এনেছি। এই কুরআন সর্বদা সঙ্গে রাখবে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে বিপদাপদ থেকে হেফাজত করবেন।'

তখন ছোট ছিলাম। দাদুর কথা বুঝতে পারিনি। এখন মনে হতে লাগল এই কুরআন কি আমাকে এখনো রক্ষা করতে পারবে? আমি তো হালাক হয়ে গেছি। এক ইহুদি মেয়ের পাল্লায় পড়ে পুরো দস্তুর ইহুদি বনে গেছি।

আমার দিনরাত কাটতে লাগলো কান্না আর শোকের মধ্য দিয়ে। হানা অনেক আশা দিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে, ওর ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টায় কোনো কমতি করল না। মানসিক যাতনা সহ্য করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম: পালাবো। আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবো। যদিও জানতাম এটা আমার জন্য এক প্রকার অসম্ভবই। কারণ আমার গতিবিধি-চলাফেরা সবই গোপনে লক্ষ্য করা হচ্ছিল। কোথায় যাই, কী করি, কার সঙ্গে কথা বলি সবই। আমি এটা টের পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি করা ছেলে। এসবের মধ্য দিয়ে জীবনের একটা সময় কাটাতে হয়েছে। তাই এসবে অভিজ্ঞ ছিলাম। ইহুদিদের কলাকৌশল আমার অগোচরে থাকল না।

অত্যন্ত গোপনে, আরেক বন্ধুকে দিয়ে টিকেট কাটালাম। অনেক পথ ঘুরে, ভিন্ন পোশাকে বিমানে উঠলাম। বিমান ছাড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে ছিলাম। দাদুর দেয়া কুরআন শরীফের জিলদখানা বুক পকেটে রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত কোনো বিপদ ছাড়াই বিমান আকাশে উড়াল দিল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আঁধার থেকে আলোর দিকে চললাম!

শিশুর ওজন

ফাতাহ সায়ীদ। কায়রো মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'WHO'-এর আওতায় জাম্বিয়া গেল। পুরো বিশ্ব থেকে বাছাই করে দশজন ইন্টার্নিকে এই কর্মশালায় আনা হয়েছে। এখন তারা জাম্বিয়ার রাজধানী থেকে অনেক দূরের এক মিশনারি হাসপাতালে আছে। এর আগে ছিল ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী এক শহরে।

ফাতাহ সায়ীদ তার বন্ধুকে বলল, 'একদিন ডিউটি পড়ল চাইল্ড কেয়ার বিভাগে। আমার সঙ্গে ডিউটিতে আছে ক্লারা জোনস। সে এসেছে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন থেকে। সেখানে এক কনভেন্ট মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। এই কলেজ থেকে যারা বের হয়, তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মিশনারি হাসপাতালগুলোতে নিয়োগ পায়।

বারো নাম্বার কেবিনে দুজন মহিলা আছেন। দুজনই সন্তানসম্ভবা। দুজনের ডেলিভারির তারিখ ও সময় মিলিয়েই একসঙ্গে, এক কেবিনে রাখা হয়েছে। অপারেশান থিয়েটারে কর্তব্যরত নার্সদের অসতর্কতায় দুটি বাচ্চা ওলটপালট হয়ে গেল। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুটোই কালো। কোন্ মায়ের কোন্ সন্তান বের করা মুশকিল হয়ে পড়ল। প্রসবের পর আরো অনেক নবজাতকের সঙ্গে মিলিয়ে রাখাতেই এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিপত্তি ঘটল।

দুই মা এখনো অচেতন। তাদের হুঁশ ফিরে আসার আগেই যা করার করতে হবে। একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আবার মিশনের প্রধান ফাদার জানতে পারলে, আমাদের সম্পর্কে ব্যাড রিপোর্ট লিখবেন। আমাদের নম্বর কমে যাবে। আবার অসদুপায়ও অবলম্বন করা যাবে না।

ক্লারা বলল, 'সায়ীদ, এখন উপায়?'

– আমরা কি টিম লিডার মিস্টার হ্যারল্ডকে বিষয়টা খুলে বলব? তার কাছে আলট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্ট থাকার কথা। তাহলে সহজেই কোন্ মায়ের পুত্রসন্তান আর কোন্ মায়ের কন্যাসন্তান জানা যাবে।

ক্লারা বলল, 'এ কাজ ভুলেও করা যাবে না। তাহলে ও ব্যাটা আমাদেরকে আর পাশ করার সুযোগই দেবে না।

– আচ্ছা, ক্লারা! একটা কাজ করতে পারবে?

– কী কাজ?

— আমার কাছে মনে হয় একটা সমাধান আছে। আমি নিশ্চিত নই। এর আগে কারো কাছে ব্যাপারটা শুনিওনি। তবুও আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে দেখতে পারি।

— তাড়াতাড়ি বলো।

— আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম তো শুনেছো।

— হ্যাঁ, কুরআন। তুমি প্রতিদিনই তো এই বই পড়।

— আমাদের ধর্মগ্রন্থে একটা বক্তব্য আছে। বিষয়টা অবশ্য উত্তরাধিকার বণ্টনের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। তা হল, "একজন পুরুষ, দুই নারীর সমান সম্পদ পাবে।" এই আয়াতকে অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে দেখি। ছেলের অংশ যেহেতু বেশি, মায়ের বুকের দুধও বোধহয় বেশি হবে। এবং ওজনও মেয়েটার চেয়ে ছেলেটার বেশিই হবে। তুমি একটু যাও তো ক্লারা! বিষয়দুটো পরীক্ষা করে এসো।

সায়ীদ বলল, 'আমরা বুকের দুধের পরিমাণ আর ওজন পরীক্ষা করে দেখলাম। নবজাতকদ্বয়কে দুই মায়ের কোলে রেখে দিলাম। দু মা-ই তাদের সন্তানকে পেয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। পরদিন আমরা কৌশলে আল্ট্রাসনোর রিপোর্ট জেনে নিলাম। আমাদের আন্দাজে ছোঁড়া ঢিলটা ভুল হয়নি। ঠিক ঠিক লেগে গেছে।'

ক্লারা বলল, 'সায়ীদ! তোমার কুরআনের কারণে আমরা বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম। আসলেই কি ছেলের মায়ের দুধ কি মেয়ের মায়ের চেয়ে পরিমাণে বেশি হয়?'

— না, আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। আমি তো বাঁচার কোনো উপায় না দেখে, ডুবন্ত মানুষের মতো কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছি। আর সেটা ঝড়ে বকের মতো লেগেও গেছে।

— তুমি যা-ই বলো সায়ীদ! আমি কিন্তু তোমার কুরআনের ব্যাপারে বেশ আগ্রহবোধ করছি।

পানিবন্ধু

বাড়ির পাশে বড় পুকুর। স্বচ্ছ টলটলে পানি। কাকচক্ষু পানি। শান বাঁধানো ঘাটে বসে পানির দিকে তাকালে পানির অনেক গভীর পর্যন্ত দেখা যায়।

আরিয়ার প্রতিদিনের অভ্যেস হল, স্কুল থেকে এসেই একবার ঘাটে এসে বসবে। শান বাঁধানো ঘাটলার সিঁড়িতে বসে, পুকুরের পানিতে বিম্বিত নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে কথা বলবে।

সে তার পানিবন্ধুর সঙ্গে হাসে। রাগ করে। অভিমান করে। আড়ি দেয়। মনের সুখ-দুখের কথা বলে। এমনকি যেসব কথা তার বান্ধবী রাইয়া-কে বলে না, সেটাও পানিবন্ধুকে বলে।

তাকে এভাবে প্রতিদিন পানির সঙ্গে কথা বলতে দেখে, ছোট ভাই যিয়ান-ও আগ্রহী আর কৌতূহলী হয়ে ওঠল।

– আপুনি, তুমি প্রতিদিন ঘাটে বসে কী করো?

– আমি কী করি না করি, তাতে তোর কী? তুই আমার খেলার পুতুল চুরি করেছিস। তোর সঙ্গে তো কাল আড়ি দিয়েছি।

– বলো না, বুবু!

– নাহ, বলবো না।

পরদিন আরিয়া তার পানিবন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল। যিয়ান চুপিচুপি, পা টিপে টিপে পেছন থেকে উঁকি দিল। দেখল, আপু পানিতে ফুটে ওঠা ছবির সঙ্গে কথা বলছে।

যিয়ান দুষ্টুমি করে ছবিটার ওপর একটা ঢিল ছুঁড়ে মারল।

পানিতে তরঙ্গ সৃষ্টি হল। ফলে ছবিটাও মিলিয়ে গেল।

– তুই আমার ছবি নষ্ট করলি কেন?

– তোমার ছবি কোথায়, ওটা তো পানি।

আরিয়া কথা না বাড়িয়ে হাত দিয়ে ছবিটাকে জোড়া লাগাতে চেষ্টা করল। পানির নড়াচড়ার কারণে ছবিটা ভেঙে ভেঙে দেখা যাচ্ছিল। আরিয়া এখানে ওখানে হাত দিয়ে পানির তরঙ্গ থামাতে চেষ্টা করল। এতে পানির তরঙ্গ তো থামলই না। উল্টো আরো বেড়ে গেল।

পাশ দিয়ে জাহিদ চাচ্চু যাচ্ছিলেন। ভাই-বোনের ঝগড়া দেখে তিনি বললেন,
– ঝগড়া করছো কেন, আরুমণি?
– এই দেখুন না চাচ্চু! যিয়ানটা আমার ছবি নষ্ট করে ফেলেছে।
– কিভাবে?
আরিয়া খুলে বলল। চাচ্চু মুচকি হেসে বললেন,
– এটার একটা সমাধান আছে।
– কী সেটা?
– তুমি যেভাবে আছো, চুপচাপ ধৈর্য ধরে বসে থাকো। পানিকে শান্ত হতে দাও। তাহলেই কিছুক্ষণ পর আবার তোমার ছবি দেখতে পাবে।

জীবনের জয়গান

জীবন চলার পথেও অনেক সময়, অনেক সমস্যা সামনে আসে। সমাধান করতে গেলে আরো জট পাকিয়ে যায়। গিঁঠ খুলতে গেলে আরো আঁটো হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে, পরিবেশ পরিস্থিতি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। জীবনে আগের মতো স্থিতি আসে। স্বস্তি আসে। সুখ আসে।

বোকার কারখানা

অধ্যাপক মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস নিচ্ছেন।

– তোমরা কি জানো কীভাবে বোকা তৈরি হয়?

– জি না, স্যার।

– চলো ভার্সিটির চিড়িয়াখানায়। বিষয়টা আমরা বানর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব।

অধ্যাপক বানরের খাঁচার ঠিক মধ্যখানে এক কাঁদি কলা ঝুলিয়ে দিলেন। কাঁদির নিচে একটা উঁচু টুল রাখলেন।

এবার পাঁচটা বানর খাঁচায় ছেড়ে দিলেন। একটা বানর উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল এক কাঁদি কলা ঝুলছে। লাফিয়ে টুলে উঠল।

তখন অধ্যাপক ছাত্রদেরকে বললেন, 'তোমরা টুলের উপরের বানরটাকে ঠান্ডা পানি ছুঁড়ে মারো।'

ছাত্ররা পানি ছুঁড়তে শুরু করল। অধ্যাপক নিজেও অন্য চার বানরকে বরফশীতল পানি ছিটাতে লাগলেন।

পানির তোড় সইতে না পেরে উপরের বানরটা নেমে এল। অধ্যাপক সবাইকে পানি ছিটানো বন্ধ করতে বললেন।

লোভ সামলাতে না পেরে, কিছুক্ষণ পর আরেকটা বানর টুল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল। আবার সবাই মিলে বানরগুলোকে পানি ছিটানো শুরু করল। বাধ্য হয়ে নেমে এল বানরটা। পানি ছিটানোও বন্ধ হল।

এবার তৃতীয় বানর চেষ্টা চালাল। বাধা পেয়ে নেমে এল।

চতুর্থ বানরের অবস্থাও আগেরগুলোর মতোই হল।

পঞ্চম বানর যখন টুলে চড়ল, সবাই পানি ছিটানো শুরু করল।

অবাক করা ব্যাপার যে, এবার অন্য বানরগুলোও ছাত্রদের দেখাদেখি নিচে জমে থাকা পানি তুলে ছুঁড়তে লাগল। পঞ্চম বানরটাও নেমে আসতে বাধ্য হল।

এভাবে বাধা পেয়ে পাঁচটা বানরই চেষ্টা ছেড়ে দিল। দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও বানরগুলো আর কলা খাওয়ার সাহস করল না।

অধ্যাপক এবার খাঁচা থেকে একটা বানর বের করে আনলেন। ওটার জায়গায় নতুন একটা বানর এনে রাখলেন। নতুন বানরটা খাঁচায় ঢুকেই দেখল, উপরে মর্তমান কলা

ঝুলছে। লাফ দিয়ে টুলে চড়ে বসল। কলাগুলো ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু বাকি চার বানর একজোট হয়ে টুলটা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল আর পানি ছুঁড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে বানরটা নেমে এল। কিছুক্ষণ পর নতুন বানরটা আবার চেষ্টা করল। আবারও বাধার মুখে নেমে এল। এভাবে কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর বানরটা বুঝতে পারল, টুলে উঠে কলা খাওয়া তার জন্য ঠিক নয়। যদিও কারণটা তার অজানা।

অধ্যাপক পুরনো চারটা থেকে আরেকটা বানর বের করে আনলেন। সেটার স্থানে নতুন আরেকটা বানর রেখে দিলেন। এই নতুন বানরটা কলা দেখেই লাফিয়ে উঠল। বাকি বানরগুলো টুল ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। পানি ছিটাতে লাগল। একটু আগে আসা বানরটা যখন দেখল তার আশেপাশের বানরগুলো টুল ধরে ঝাঁকাচ্ছে, সেও তখন অন্যদের দেখাদেখি টুল ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। এবার সদ্য আসা বানরটা বাধার মুখে নেমে এল।

এভাবে একে একে পুরনো বানরগুলোর জায়গায় নতুন নতুন বানর রাখা হল। প্রতিবারই আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল।

অধ্যাপক বললেন, 'দেখো! আমরা কিন্তু এই নতুন বানরগুলোর কোনটাকেই পানি ছুঁড়িনি। কিন্তু এগুলো অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে পানি ছোঁড়া শিখেছে।

'আমরা বানরগুলোকে যদি প্রশ্ন করি, তোমরা কেন টুলে ওঠা বানরটাকে পানি ছুঁড়ে মারো? টুলটা ধরে ঝাঁকি দাও? নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায়, উত্তর হবে আমরা আগের বানরগুলোকে এভাবে করতে দেখেছি।'

প্রিয় ছাত্ররা! পৃথিবীতে জ্ঞানেরও কোনো শেষ নেই। অজ্ঞতারও কোনো শেষ নেই। জ্ঞানের পথে যেতে হলে, নিজের মেধা-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এগুতে হবে। অন্ধ অনুকরণ নিজের যোগ্যতার বিকাশ ব্যাহত করে।

আল্লাহর বিচার

আলী তানতাভী। বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বিচারক ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

আমার ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের শুরুর দিকের ঘটনা। আমরা প্রতিদিন বিকেলে, একদিন একেক বন্ধুর বাসায় বসে আড্ডা জমাতাম। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। তর্ক-বিতর্ক হতো। মতবিনিময় হতো।

একদিন আমরা এক বন্ধুর বাড়িতে জড়ো হলাম। কিছুক্ষণ পর আমার আর বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হলাম।

হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর আসার পর, কানে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ এল। কেউ একজন গভীর বেদনায় অধীর হয়ে কাঁদছে। সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষের মতো কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এক নাগাড়ে। শুনে আমার ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কাছে গেলাম। দেখলাম এক মহিলা বসে বসে কাঁদছে।

– বোন! তুমি অমন করে কাঁদছো কেন?

– আমার স্বামী অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী। আমার সঙ্গে সবসময় রূঢ় আচরণ করে। পশুর মতো ব্যবহার করে। আমাকে বিন্দুমাত্র মূল্য দেয় না। সন্তানদের সামনেই আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আজ তো আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। আমার সন্তানদের রেখে দিয়েছে। বলে দিয়েছে, আমি যেন কখনো তার ঘরে না ঢুকি। আমি এখন কোথায় যাবো, কার কাছে যাবো, কী করবো?

– বোন! এতদিন বিচারকের কাছে যাওনি কেন?

– এক অবলা অসহায় নারীর কথা বিচারক বিশ্বাস করবেন? আর বিচারকের কাছে কীভাবে যেতে হয় আমি জানি না। বিচারক কোথায় থাকেন তাও জানি না। আমি আমার আল্লাহর কাছে বিচার দিচ্ছি। তিনিই এর বিচার করবেন।

আলী তানতাভী বলেন, 'মনে মনে বললাম, বোন! তুমি বিচারকের কাছে যেতে না পারলেও, আল্লাহ তোমার কাছে ঠিকই একজন বিচারক পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তিনি বান্দার ডাক কখনো বৃথা ফেরত পাঠান না।'

নিশ্চয়ই এতে কোনো কল্যাণ আছে

পাহাড়ঘেরা এক জনপদ। পরপর এমন কয়েকটা জনপদ পাশাপাশি আছে। অধিবাসীদের সবার পেশা মেষপালন। এটা দিয়েই তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। মেষপালকদের মধ্যে একজন লোক আছে। তার ব্যাপারে সবার মনেই কৌতূহল। যখন যা-ই ঘটুক লোকটা বলে, 'নিশ্চয়ই এতে কোনো কল্যাণ অছে।'

ছোট বিপদ, বড় বিপদ, সব বিপদাপদেই লোকটা বলে, 'নিশ্চয়ই এতে কোনো কল্যাণ নিহিত আছে।'

অন্য লোকেরা একদিন ঠিক করল, লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখবে। অন্যদের বিপদ দেখলেই শুধু একথা বলে, নাকি নিজের বিপদেও এমন বিশ্বাস রাখে? সুযোগ বুঝে একদিন তারা লোকটার সব মেষ চুরি করে পাশের গ্রামে লুকিয়ে রাখল। সবাই মিলে যুক্তি করে তার কাছে খবর দেয়ার জন্য একজনকে পাঠাল।

– ও ভাই! তোমার মেষ তো সব চুরি হয়ে গেছে।

– আচ্ছা! তাই নাকি? নিশ্চয়ই এতে কোনো কল্যাণ আছে। তা কীভাবে চুরি হল?

– আমরা দুপুরে সবাই খাবার খেতে এলাম। এ সময় প্রতিদিনই মেষগুলো একা একা চরে বেড়ায়। আজও চরে বেড়াচ্ছিল। আমরা খাবারের পর গিয়ে দেখি তোমার মেষগুলো নেই।

লোকটা বিষণ্ন হল। চিন্তিত হলেও ভেঙে পড়ল না। লোকেরা দেখল, সে বিচলিত হয়নি। অন্যদের বেলায় যেমন বলে থাকে তার নিজের বেলায়ও একই ব্যাপার ঘটেছে। তারা বলল, 'এটা বোধহয় তার ভান। আমাদের দেখানোর জন্য এমন করেছে। ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। আমাদের সামনে যদিও প্রকাশ করছে না। আমরা চলে গেলেই গলা ছেড়ে কাঁদতে বসবে। আজ তাকে ছেড়ে এক চুলও নড়বো না। তার শেষ দেখা দেখেই ছাড়বো। রাতের বেলা একা হলে সে কী করে তা দেখে তবেই যাবো।'

লোকটাকে সান্তনা দেয়ার ছলে সবাই রয়ে গেল। নানা কথায় তাকে ভোলাতে লাগল। মেকি সান্তনা দিয়ে যেতে লাগল। তারা যতই সান্তনাবাক্য বলে, লোকটা শুধু এককথাই বারবার আওড়ে যায়,

– নিশ্চয়ই এতে কোনো কল্যাণ আছে। আল্লাহ তো বান্দার ক্ষতির জন্য কোন কাজ করেন না। আমার যা ঘটল, তা তো আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে।

গ্রামের লোকেরা নিজেদের বাড়িঘর খালি করে রেখে এসেছিল। এটা দেখে পাশের গ্রামের মহা ধড়িবাজ একদল চোর ভাবল, এই তো মহাসুযোগ। চোরেরা এসে গ্রামের লোকদের মেষগুলো চুরি করে নিয়ে গেল। সকালে সবাই যে যার বাড়ি এসে দেখল মহা সর্বনাশ! সবার মেষগুলো চুরি হয়ে গেছে। এখন উপায়? সবাই লোকটার কাছে গিয়ে বলল:

– আমরা অন্যায় করে ফেলেছি।

– কী অন্যায়?

– আমরা তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এসব করেছি। তোমার মেষগুলো পাশের গ্রামে একটা বাড়িতে লুকিয়ে রাখা আছে। আমাদের সবার মেষ চুরি হয়ে গেছে। শুধু তোমার মেষগুলোই অক্ষত আছে।

– নিশ্চয় এতে কোনো কল্যাণ আছে।

কে বেশি ভালো?

আহমাদ। এবার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বের হয়েছে। অনেক ঘোরাঘুরি আর ধরাধরি করল; কিন্তু কোনো চাকরির বন্দোবস্ত হল না। একজন পরামর্শ দিল, অন্য শহরে গিয়ে দেখো।

আহমাদ তাই করল। দূরের এক শহরে চলে গেল। যাওয়ার পথে, গাড়িতে কথায় কথায় এক যুবকের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। যুবকের নাম খালিদ। খালিদ বড় লোকের ছেলে। নিজেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। নিজ থেকে প্রস্তাব দিল,

– তুমিও আমাদের কোম্পানিতে যোগ দাও।

আহমাদ কোনোরকম চিন্তভাবনা ছাড়াই রাজি হয়ে গেল। দুজনে মিলে কোম্পানিটা আবার নতুন করে দাঁড় করাল। আহমাদ কারিগরি দিকটা দেখাশোনা করে। খালিদ মার্কেটিংয়ের দিকটা।

ব্যবসা দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠল। বিভিন্ন শহরে শাখা খোলা হল।

একদিন আহমাদ দেখল, খালিদের টেবিলের ওপর একটা ছবি পড়ে আছে। এক অনিন্দ্য সুন্দর মেয়ের ছবি। ছবি দেখে সে মুগ্ধ হল। খালিদ অবাক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বিষয়টা আহমাদের দৃষ্টি এড়াল না। খালিদ শেষে আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করল:

– এটা কার ছবি?

– এটা আমার বাগদত্তার ছবি। তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কেন, তোমার কি ছবিটা পছন্দ হয়েছে?

– হাঁ, সুন্দর তো সবারই পছন্দ হবে।

– তুমি সুযোগ পেলে এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাও?

– এমন হীরের টুকরো মেয়ে পেলে কেউ অমত করে?

– ঠিক আছে। আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব না। তোমার জন্য ছেড়ে দিলাম।

– না না, তা কী করে হয়! তোমার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চলছে। সেখানে আমিইবা উটকো হয়ে নাক গলাবো কেন?

— বিয়ের কথাবার্তা সবে শুরু হয়েছে। চূড়ান্ত কিছু তো হয়নি। আর কথা বাড়িও না। রাজি হয়ে যাও।

মেয়েটার সঙ্গে আহমাদের বিয়ে হল। কিছুদিন পর আহমাদের ইচ্ছা হল, নিজ শহরে চলে যাবে। বউ-বাচ্চা নিয়ে মা-বাবা, ভাই-বোনদের সঙ্গে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে।

কোম্পানির আয়-ব্যয় হিসাব করে আহমাদ তার প্রাপ্য বুঝে নিয়ে চলে এল। নিজ শহরে এসে ব্যবসা শুরু করল। আস্তে আস্তে তার ব্যবসা বড় হতে লাগল।

ওদিকে কী এক সমস্যার কারণে দিন দিন খালিদের ব্যবসায় মন্দা পড়তে লাগল। অনেক দিনের পুরনো এক মামলায় হেরে গিয়ে, পুঁজিপাতি সব খুইয়ে, স্বর্বস্বান্ত হয়ে পথে নেমে আসতে হল। এখন সে পথের ফকির।

একদিন আহমাদ ব্যবসার কাজে আগের শহরে এল। পথিমধ্যে দেখল, খালিদ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। জামাকাপড় ময়লা আর জীর্ণ। খালিদও দেখতে পেল আহমাদকে; কিন্তু আহমাদ দেখেও না দেখার ভান করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। খালিদ মনে বড় ব্যথা পেল; কিন্তু কিছুই করার নেই।

এভাবে দিন চলতে লাগল। একদিন খালিদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ লোকের দেখা। বৃদ্ধ লোকটি তার দুরবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হল। সঙ্গে করে খালিদকে বাড়িতে নিয়ে এল। ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করল। থাকার জায়গা করে দিল। একটা চাকরিও জুটিয়ে দিল। পাশাপাশি একটা ব্যবসা ধরিয়ে দিল। আস্তে আস্তে খালিদের অবস্থাও ফিরে এল।

একদিন বৃদ্ধ লোকটি বললেন,

— বাবা! তোমার কাজকর্ম দেখে আমার পছন্দ হয়েছে। আমি তোমার পূর্বের ইতিহাসও খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, তুমি বড় ঘরের ছেলে। আমার একটা মেয়ে আছে। আপত্তি না থাকলে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই।

বিয়ে ঠিকঠাক। বিরাট আয়োজন করা হল। অনুষ্ঠানে ছোটরা বিয়ের গান গাইছে। এমন সময় আহমাদ স্ত্রীসহ বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রবেশ করল। খালিদ অবাক হল। তার রাগও হল। এত বড় নিমকহারামির পর এ লোক আবার এখানে আসে কী করে? আমি তো তাকে দাওয়াতও দিইনি।

খালিদ হনহন করে মঞ্চে গেল। মাইক্রোফোন নিয়ে সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ জানাল। আগপিছ না ভেবে ঝোঁকের বশে বলল, 'আমি আমার বন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছি,

যাকে আমি বিপদে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তার দুর্দিনে পাশে দাঁড়িয়েছিলাম; কিন্তু আমাকে নিঃস্ব অবস্থায় দেখে সে রাস্তা বদল করে অন্যপথ ধরেছিল। আমাকে দেখেও না দেখার ভান করেছিল।

আমি আমার এমন বন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমার বাগদত্তা হবু স্ত্রীকে পর্যন্ত যাকে আমি দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বন্ধু আমার অসহায়ত্বের দিনে আমার দিকে ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি।

এসব বলতে বলতে তার গলা বুজে এল। কান্নার আবেগে তার গলা আটকে গেল। এবার আহমাদ এগিয়ে এল। মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিল। বলল, 'দুঃখিত বন্ধু! আমি তোমাকে দেখে রাস্তা বদল করেছিলাম। কারণ, আমাকে ধনী আর তোমাকে দরিদ্র আর নিঃস্ব দেখতে তোমার ভালো লাগবে না, এটা ভেবে। তোমার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে ভেবেই আমি এমনটা করেছিলাম।

দুঃখিত বন্ধু! আমি সরাসরি সাহায্য করতে পারিনি। কারণ এ অবস্থায় সাহায্য করলে তোমার কাছে দান বা অনুগ্রহ বলে মনে হতে পারে। তাই আমার পিতাকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে সাহায্য করার জন্য।

দুঃখিত বন্ধু! আমি তোমার হবু বাগদত্তাকে বাগিয়ে নিয়েছি। কিন্তু জ্ঞানে-গরিমায় অত্যন্ত চৌকশ আমার ছোটবোনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

খালিদ এসব শুনে অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

পুনশ্চ: খালিদ ও আহমাদ উভয়েই অত্যন্ত ভালো মানুষ। মহৎ মানুষ। এখন প্রশ্ন হল, দুজনেই মধ্যে কে বেশি ভালো?

না পারার পরিতৃপ্তি

সেন্ট কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি। ত্রিকোণোমিতির সাপ্তাহিক ক্লাস চলছে। ভিজিটিং প্রফেসর রবার্ট ব্রুস ক্লাস নিচ্ছেন। এমন সময় কার্ল হপার দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্লাসে এসে বসল। কার্ল অত্যন্ত পরিশ্রমী ছাত্র। পড়ালেখার ফাঁকে একটা হোটেলে বয়ের কাজ করে। লেখাপড়ার খরচ যোগানোর জন্য তাকে এটা করতে হয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করেই সে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

গত কয়েক দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের কারণে সে ঠিকমত ঘুমুতে পারেনি। ক্লাসে এসে পেছনের বেঞ্চিতে জায়গা পেল। অংকের জটিল আলোচনার ধাক্কায় তার ঘুম পেয়ে গেল। টুলে মাথা রেখে একসময় ঘুমিয়েই পড়ল। ছাত্রদের হৈ চৈ আর শোরগোলে তার ঘুম ভাঙল। ক্লাস শেষ।

কার্ল দেখল প্রফেসর বোর্ডে দুটো অংক লিখে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি করে সে অংকদুটি খাতায় টুকে নিল। ভাবল, এটা বাড়ির কাজ।

মেসে এসে অংক দুটো নিয়ে বসল। প্রথমে মাথায় কিছুই ঢুকল না। ভার্সিটি লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই যোগাড় করে আবার বসল। একটানা চারদিনের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার পর একটা অংক মেলাতে পারল।

কার্ল রাগে গজরাতে লাগল। এত কঠিন অংকও কেউ হোমওয়ার্ক দেয়? তাও চারদিনের চেষ্টায় মাত্র একটা অংকের সমাধান করতে পেরেছে। আরেকটা সমাধান করতে কতদিন লাগে কে জানে?

পরের সপ্তাহে ক্লাসে সে আগে আগেই হাজির হল। সামনের বেঞ্চিতে জায়গা করে নিল। অন্যরা অংকগুলো কিভাবে সমাধান করেছে যাচাই করে দেখতে হবে।

কার্ল লক্ষ্য করল, আজকের ক্লাস শেষ হয়ে এল; কিন্তু প্রফেসর একবারও হোমওয়ার্ক চাইলেন না। অবাক করা ব্যাপার! এমনটা তো হওয়ার কথা নয়?

– স্যার! এ সপ্তাহের হোমওয়ার্ক দেখবেন না?

– কিসের হোমওয়ার্ক?

– কেন গত সপ্তাহে বোর্ডে যে দুটো অংক দিয়েছিলেন সেগুলো?

– আমি তো গত সপ্তাহে কোনো হোমটাস্ক দিইনি। বোর্ডে লেখা যে দুটো অংকের কথা বলছো, সেগুলো তো আমি উদাহরণস্বরূপ লিখেছিলাম।

এখন পর্যন্ত বিশ্বে যে কয়টা অংক সমাধানের অতীত বলে মনে করা হয়, বোর্ডে লেখা অংকদুটো ছিল তার অন্যতম।

– কিন্তু স্যার, আমি তো তার একটরা সমাধান করে এনেছি।

– কী বলছো তুমি? এ তো অবিশ্বাস্য। কই দেখি দেখি?

শিক্ষক কার্লের খাতা দেখে আকাশ থেকে পড়লেন। এটা কিভাবে সম্ভব?

গল্পের নির্যাস

- এই অংক সমাধানযোগ্য নয়। এ অংক দুর্বোধ্য। কেউ এর সমাধান করতে পারবে না। বহুদিন ধরে চলে আসা এ বদ্ধ ধারণার কারণে কেউ আর চেষ্টা করে দেখেনি, আসলেই কি তাই?

- আমরা অনেক বিষয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি, আশপাশের কল্পিত অবরোধের কারণে। আমরা শুনে শুনেই ধরে নিই এ কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আর চেষ্টাও করতে যাই না। না পারার পরিতৃপ্তি নিয়েই বেঁচে থাকি।

- কার্ল যদি সেদিন ঘুমিয়ে না থাকতো, সেও প্রফেসরের লেকচার শুনে বিশ্বাস করে বসতো এ অংকদুটো আনসলভেবল (সমাধানাতীত)। সে আর চেষ্টা করতো না।

- অনেক সময় ঘুম অর্থাৎ আশপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মধ্যে ডুবে থাকাটা জরুরি হয়ে পড়ে। না হলে পারিপার্শ্বিক নানা নেতিবাচকতায় প্রভাবিত হয়ে নিজের স্বকীয় প্রতিভায় মরচে পড়ে যায়।

মনের বাঘ

বিরাট গ্রোসারি শপ। মুদি দোকান। অনেকটা সুপারশপ আকৃতির। টম এই দোকানে তিন বছর যাবত কাজ করছে। একটু বোকাটে হলেও টম কাজকর্মে বেশ বিশ্বস্ত। বুড়ো ম্যানেজার ভিক্টর তাকে বেশ পছন্দ করে। বিশ্বাসও করে। সেজন্য ভাঁড়ার ঘরের চাবি, ফ্রিজের চাবি টমের কাছেই থাকে।

প্রতিদিনের মতো আজও টম ফ্রিজ পরিষ্কার করতে এসেছে। বিরাট ফ্রিজ। বিশেষ অর্ডার দিয়ে ফ্রিজটা বানানো হয়েছে। আজ দুই বছর ধরে সে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে যাচ্ছে। যতবারই ফ্রিজটা খোলে, অবাক হয়। এত বড় ফ্রিজও হয়? পুরো একটা পল্টন সেঁধিয়ে দেওয়া যাবে।

আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরতে হবে। বাসায় কাজ আছে। একা একা থাকার যে কত ঝক্কি! আগামীকাল উইকএন্ড। সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

টম ফ্রিজটা পরিষ্কার করার জন্য ফ্রিজের ভেতরে ঢুকল। এ-মাথা ও-মাথা পরিষ্কার করা প্রায় শেষ। এমন সময় ফ্রিজের দরজাটা বেকায়দায় বন্ধ হয়ে গেল। অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও দরজাটা খোলা গেল না। টমের মনে ভয় ঢুকে গেল। এখন তো শেষ সময়। কারো এদিকে আসার সম্ভাবনাও নেই। সবাই তাকে না দেখে ভাববে, সে চলে গেছে। আগামী দুদিন শপ বন্ধ থাকবে। খুলবে সেই সোমবারে। ততদিনে সে জমে বরফ হয়ে যাবে। মরে ভূত হয়ে যাবে। টম উপায়ান্তর না দেখে নিজেকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিল। ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুণতে শুরু করল।

দুদিন পর লোকেরা এসে দোকান খুলল। ফ্রিজ খুলে দেখে টম মরে দলা পাকিয়ে আছে। পাশে রাখা আছে একটা চিরকুট। তাতে লেখা,

> 'আমি এখন এই ফ্রিজে বন্দী। অনুভব করছি, আমার হাত-পা আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে যাচ্ছি। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে আসছে। আমি ঠান্ডায় ম... .রে.... য..া...চ্ছি..........'

লেখাটা আস্তে আস্তে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে গেছে।

বুড়ো ম্যানেজার ভিক্টর ভালো করে দেখে বলল, 'এ তো ঠান্ডায় মরেনি। ঠান্ডায় মরলে শরীর শক্ত থাকতো। শরীর থেকে গন্ধ বের হত না। আর ফ্রিজ পরিষ্কার করার আগে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করেই পরিষ্কার করার কথা। এখনো ফ্রিজের বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন!'

যা ভাবতে পারি,

- টমকে বনের বাঘে খায়নি, খেয়েছে মনের বাঘে।
- টম ভেবেছিল ফ্রিজের ভেতর তাপমাত্রা তো শূন্য ডিগ্রির নিচে থাকে। হিমাঙ্কের নিচে থাকে। এই ঠান্ডায় মানুষের জমে যাওয়ার কথা। এই বদ্ধমূল ধারণার নিগড়েই সে বন্দী হয়ে ছিল।
- নেতিবাচক চিন্তাগুলোই আমাদেরকে জীবনে অনেকবার হত্যা করে। মরার আগেই অসংখ্যবার মারে।
- আমরা অনেক সময় মাথার ভেতরে বাসা বেঁধে থাকা চিন্তার কারণে, মনে করি আমি দুর্বল। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।
- আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে যদি কাজে নেমে পড়ি, দেখা যাবে বাস্তবতা আমাদের ভুল ধারণার চেয়ে ভিন্ন।

দুআর টানে

ডাক্তার শাহীন ইফাদ। বিশ্ববরেণ্য সার্জন। জন্ম আজাদ কাশ্মীরে। বর্তমান নিবাস পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। কর্মস্থল ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল। পুরো পাকিস্তানের মানুষ এক নামে তাকে চেনে। সবাই বলে, তার হাতে জাদু আছে। সহকর্মীরা দুষ্টুমি করে বলে শাহীনের হাতে দুটো হাড় ধরিয়ে দিলেও সে জোড়াতালি দিয়ে ঠিকই একটা কিছু দাঁড় করিয়ে ফেলবে। বাকি থাকবে শুধু প্রাণটুকু।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে, ইসলামাবাদ থেকে দিল্লিগামী বিমানে চড়লেন। ভারত সীমান্তে পৌঁছার আগেই বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল। বিমান জরুরী অবতরণ করল সীমান্তবর্তী এক শহরে। ডাক্তার বিমানের পাইলটকে বললেন, 'আমাকে জরুরিভিত্তিতে বড় কোন শহরে পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা দিতে হবে। বিষয়টা খুবই জরুরি।'

পাইলট সেই ছোট শহরের বিমানবন্দর থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। চালক নেই। নিজেকেই চালাতে হবে। গন্তব্যে পৌঁছে গাড়িটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখলেই চলবে। বাইরের আবহাওয়া খুবই খারাপ। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। উইন্ডশ্বিনে সামনের পথ দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তার শাহীন আন্দাজের ওপর গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে দুঘণ্টা চলার পর বুঝতে পারলেন, তিনি পথ হারিয়েছেন। একটানা গাড়ি চালিয়ে ক্লান্তি অনুভব করলেন। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কখন ঝড়-তুফান থামবে।

ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপুনি শুরু হল। দাঁত কপাটি লাগার মতো অবস্থা। ভালো করে ঠাহর করে দেখলেন রাস্তার পাশেই একটা ছোটখাটো ঘর। দৌড়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন। করাঘাত করলেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, 'দরজা খোলাই আছে। যে-ই হোন ভেতরে আসুন।'

ডাক্তার ভেতরে গেলেন। দেখলেন এক বৃদ্ধ মহিলা বসে আছেন। ডাক্তার বললেন, 'আপনাদের এখান থেকে একটা টেলিফোন করা যাবে?'

— টেলিফোন তো দূরের কথা বাবা! আমাদের এই জনপদে বিদ্যুতেরও দেখা নেই। তুমি বসো। আরাম করো। একদম ভিজে গেছো দেখছি। ওখানে শুকনো কাপড় আছে। পরে নাও। মাথা মুছে ফেলো।

বৃদ্ধার আন্তরিক আচরণে ডাক্তার অভিভূত হলেন। বৃদ্ধা বললেন, 'আর তোমার বোধহয় ক্ষুধাও লেগেছে। ঘরে সামান্য কিছু খাবার আছে। তুমি খেয়ে ফেলো। আমরা খেয়েছি।'

ডাক্তার কথা না বাড়িয়ে খেতে বসলেন। ভীষণ ক্ষুধা লেগেছিল। এতক্ষণ টের পাননি। খাবারের কথা শোনার পর ক্ষুধা যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

বৃদ্ধা খাবারের ব্যবস্থা করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের ফাঁকে ফাঁকে একটা কিছু নাড়া দিচ্ছিলেন। এতক্ষণে ডাক্তারের চোখ পড়ল খাটের ওপর। সেখানে একটা ছোট ছেলে শোয়া আছে। কোনো নড়াচড়া নেই। জড়বৎ শুয়ে আছে।

বৃদ্ধা নাড়া দিয়েই নামায আর দুআয় মশগুল হয়ে পড়লেন। যেন ডাক্তারের উপস্থিতির কথা ভুলেই গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আর চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলেন,

– আপনার আতিথেয়তার কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আল্লাহ তাআলা আপনার মনের বাসনা পূরণ করুন। আপনি এত কী দুআ করছেন?

– বাবা! তুমি মেহমান। তোমার আদর-আপ্যায়ন করা তো একজন মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব। আর দুআর কথা যে বললে, আল্লাহ তাআলা আমার সব দুআই কবুল করেছেন। শুধু একটা দুআই বাকি আছে।

– কী সেই দুআ যেটা আল্লাহ এখনো কবুল করেননি? আমাকে বলা যাবে? জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

– এই খাটে শোয়া ছেলেটা দেখতে পাচ্ছো? ও আমার একমাত্র নাতি। তার বাবা-মা দুজনই মারা গেছেন। আমাদের দুজনেরই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। সে এক দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছে। স্থানীয় ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, একে বাঁচাতে হলে জটিল একটা অপারেশান করতে হবে। এটা পাকিস্তানে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র ডা. শাহীন ইফাদের পক্ষেই এই অপারেশন করা সম্ভব। আমি এতবড় ডাক্তারকে কোথায় পাবো? আর আমার এত টাকাই বা কোথায়? শুনেছি বেশিরভাগ সময় তিনি দেশে থাকেনও না। আর নাতিকে এই অসুস্থ শরীরে অত দূরে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তাই আমি আল্লাহর কাছে বিষয়টা সহজ করে দেওয়ার জন্য দুআ করে যাচ্ছি।

ডাক্তার শাহীন বৃদ্ধার কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। বললেন: 'বুড়িমা! আপনার এই অবশিষ্ট দুআও আল্লাহ কবুল করেছেন। আপনার দুআ আল্লাহ তাআলা কিভাবে কবুল করেছেন শুনুন।'

– প্রথমে তিনি বিমান নষ্ট করেছেন। এরপর ঝড়-তুফান পাঠিয়েছেন। এরপর আমাকে পথ ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে এসেছেন।

বৃদ্ধা বললেন,

– আল্লাহ তাআলা বান্দার দুআর বরকতে সব অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখান। যখন সমস্ত মাধ্যম শেষ হয়ে যায়, কোনো উপায় থাকে না তখন একমাত্র আল্লাহর দরজাই খোলা থাকে।
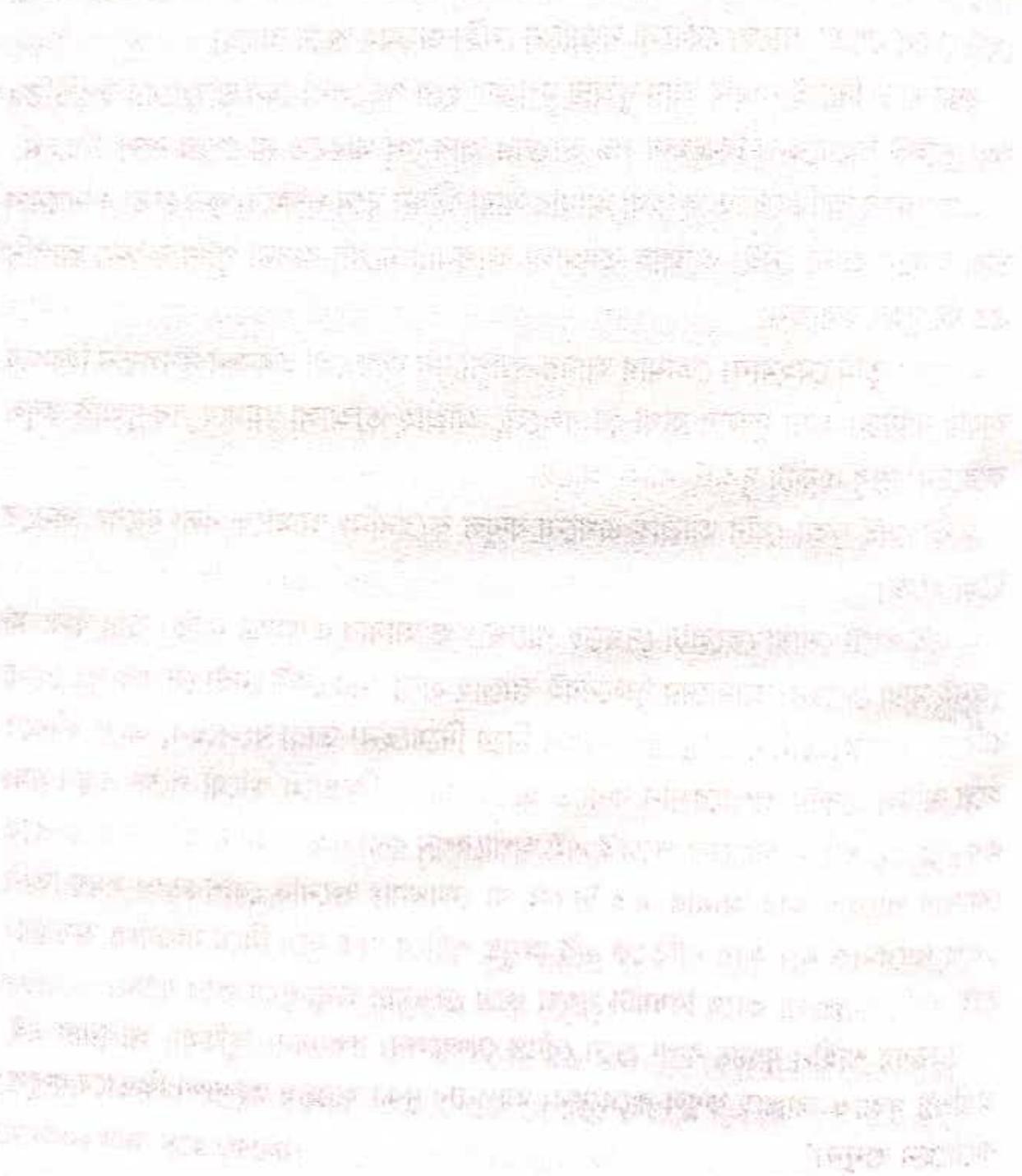
সুন্দর ও অসুন্দর মানুষ

• বয়স •

কোরিয়ায় ভদ্র পরিবারগুলোর একটা সুন্দর রীতি হচ্ছে, প্রথম সাক্ষাতে, নাম জানতে চাওয়ার আগে বয়স জানতে চায়। যাতে কথা বলার সময় উপযুক্ত সম্বোধন করতে পারে।

• প্রজ্ঞা •

মিশরে কেউ কেউ প্রথম সাক্ষাতেই, পেশা সম্পর্কে জানতে চায়। যাতে কী সুবিধা লাভ করা যায়, সেটা বুঝতে সহজ হয়।

• স্বার্থ •

উপসাগরীয় দেশগুলোতে কেউ কেউ প্রথম সাক্ষাতেই গোত্র-বংশ সম্পর্কে জানতে চায়। যাতে প্রথমেই আন্দাজ করে নিতে পারে, সম্মান করবে নাকি অসম্মান করবে।

• গোত্রপ্রীতি •

আয়েশা ﵂ দান করার আগে মুদ্রাটা মেশকযুক্ত রুমাল দিয়ে মুছে নিতেন।

• অদ্ভুত মানবিক সৌন্দর্য •

উমর ﵁ চিনি পছন্দ করতেন। তিনি সুযোগ পেলেই চিনি দান করতেন। কুরআনের এ আয়াতের ওপর আমল করার জন্যে:

« প্রিয় জিনিস দান না করা পর্যন্ত, তোমরা পরিপূর্ণ পুণ্য লাভ করতে পারবে না। »

[সূরা আলে ইমরান, ০৩: ৯২]

এক লোক মসজিদে নামায পড়তে গেলে, দু'পাশের মুসল্লীদের জন্যে দু'আ করতেন। চেনা-অচেনা বাছ-বিচার না করেই।

• দরদী মন •

এক শিক্ষিকা ক্লাসে গিয়ে প্রথমেই গরীব ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে নজর দিতেন। তাদের পোশাক-আশাক ঠিক করে দিতেন। চুল আঁচড়ে দিতেন। বইপত্র গুছিয়ে দিতেন। সকালে নাস্তা জুটেছে কি-না জানতে চাইতেন।

• মমতাময়ী •

পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোতে আত্মীয়-স্বজন সবাই একসঙ্গে হয়। পুরো পরিবার নিয়েই হাজির হয় অনেকে। নিজের বাড়িতে আয়োজন হলে, মহিলাটি আলাদা করে, কাজের ছেলে-মেয়েকেও দাওয়াত দেয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সবাইকে একত্র করে দ্বীনের কথা বলে। নবী-সাহাবীর গল্প শোনায়। তাদেরকে ছোট্ট হলেও কিছু উপহার দেয়। গুরুত্ব দিয়ে তাদের খাবার বেড়ে দেয়। এটা ওটা পাতে তুলে দেয়।

• ফিরিশতাসম মানুষ •

মানুষটা মসজিদে গেলে বা সুযোগ পেলেই দু'য়েক টাকা দান করে। মাঝে মধ্যে নিয়ত করে। অসংখ্য মৃত মুসলমানদের জন্যে, যাদের পক্ষে দান করার মতো কেউ নেই।

• একজন অসম্ভব ভালো মানুষ •

লোকটা বাসে উঠলে, পাশের লোক ঝিমুতে ঝিমুতে তার গায়ে ঢলে পড়লেও কিছু বলে না। মাথাটা সরিয়ে দেয় না। রাগতস্বরে বলে না,

– এই মিয়া! সরে বসুন।

• সহনশীল •

মানুষটা কোথাও লাইনে দাঁড়ালে, বৃদ্ধ বা অসুস্থ কাউকে দেখলে, নিজের জায়গায় তাকে সুযোগ দেয়। নিজে গিয়ে পেছনে দাঁড়ায়।

এমন আরও অসংখ্য ভালো মানুষ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটু খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। শিখতে চাইলে চারপাশে উপাদানের অভাব নেই। অভাব শুধু শেখার ইচ্ছার।

কয়লার ঝুড়ি

একটা কয়লাখনির একটি ছোট শ্রমিক-নিবাস। ছোট্ট যিরাব আর তার দাদা বসে আছে। ছোটবেলায় যিরাবের বাবা-মা এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তখন থেকেই সে বৃদ্ধ দাদার কাছে থাকে। দাদা আদর-যত্নে কোনো কমতি করেন না। সবসময় এতিম নাতিকে আগলে রাখেন। মায়ের আদরে, পিতার স্নেহে মানুষ করছেন। দাদা খনিশ্রমিক হলেও ধর্মকর্ম পালনে অত্যন্ত যত্নবান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশপাশি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন।

দাদা নাতিকেও সঙ্গে রাখেন। হাতে-কলমে নামায পড়তে শেখান। কুরআন শেখান। দাদা কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলে নাতিও পাশে থাকে। যিরাব দাদার পড়া শুনে শুনে আওড়াতে চেষ্টা করে। মুখে মুখে পড়তে থাকে। একদিন দাদার কাছে জানতে চাইল,

– দাদু!

– কী?

– আমি এখন আলহামদু লিল্লাহ কুরআন কারীম দেখে দেখে পড়তে পারি। কিন্তু শুধু পড়তে পারলে হবে কি, কুরআন কারীমের কিছুই যে বুঝি না। দুয়েকটা শব্দের অর্থ বুঝলেও তিলাওয়াত শেষ করার পর সেটা আর মনে থাকে না। এভাবে না বুঝে তিলাওয়াত করলে কী লাভ?

দাদার পাশেই একটা কয়লার ঝুড়ি পড়ে ছিল। সেটা নাতির হাতে দিয়ে বললেন,

– আমার জন্য এই ঝুড়িতে করে, নদী থেকে পানি নিয়ে এসো।

যিরাব ঝুড়িটা নিয়ে নদীতে গেল। ঝুড়িটাকে পানিভর্তি করে ফিরতি পথ ধরল। ঘরে পৌঁছার আগেই সব পানি ঝরে পড়ে গেল।

দাদা হেসে বললেন,

– তুমি বোধহয় আস্তে আস্তে হেঁটেছ। আবার যাও, এবার তাড়াতাড়ি করে আসবে।

যিরাব আবার নদীতে গেল। এবার আরও দ্রুত, প্রায় দৌড়ে ফেরার চেষ্টা করল; কিন্তু তারপরও পানি থাকল না। সব পানি ঝুড়ির ফাঁক গলে পড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদাজি! এই কয়লার ঝুড়িতে পানি আনা অসম্ভব। আমি এই ঝুড়ির পরিবর্তে গোসলের বালতিটা নিয়ে যাই?

– না, বালতি নিতে পারবে না। তুমি বোধহয় যথাযথ চেষ্টা করছো না। আরো বেশি করে চেষ্টা করো।

যিরাব আবার গেল। সে বুঝতে পারল এটা একটা অসম্ভব কাজ। তারপরও দাদার আদেশ পালন করতে দ্বিধা করল না। এবার নাতির পিছুপিছু দাদাও গেলেন।

যিরাব এবার নদীর আরো গভীরে গেল। ঝুড়িটাকে ভালোভাবে ডুবিয়ে পানিভর্তি করল। এবার সর্বোচ্চ গতিতে ছুট দিল। কিন্তু কোনো ফল হল না। যিরাব হতাশ হয়ে বলল, 'দাদাজি! এভাবে হবে না। এটা একটা অর্থহীন প্রয়াস। নিষ্ফল পরিশ্রম। এত মেহনত কোনো কাজেই এল না।

– তুমি এই পরিশ্রমকে অর্থহীন বলছো? ভালো করে ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

যিরাব ঝুড়ির দিকে ভালো করে তাকাল। অবাক হয়ে দেখল, ঝুড়িটা আর আগের মতো নেই। আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার আর সুন্দর হয়ে গেছে। পুরো ঝুড়িটায় কয়লার কোনো দাগ তো নেই, বরং ওটা আগের চেয়ে অনেক নরম আর মোলায়েম হয়ে গেছে। খসখসে ভাব নেই। ভেতরে বাইরে একই অবস্থা। ধরতেও আগের মতো কষ্ট লাগছে না।

এবার দাদা বললেন,

– দেখো ভাই! তুমি যখন কুরআন তিলাওয়াত করবে, তোমার অবস্থাও এই ঝুড়ির মতো হবে। তুমি পড়ার সময় কুরআন না বুঝতে পারো। কি পড়েছো সেটা মনে না থাকতে পারে। কিন্তু তারপরও, যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে, আপনাআপনিই তোমার ভেতরে-বাইরে একটা পরিবর্তন ঘটবে। আল্লাহ এভাবেই, কুরআনের মাধ্যমে বান্দার মাঝে প্রভাব বিস্তার করেন।

বাবার চিঠি

সংসারে অভাব আর অভাব। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। অর্থের অভাব হলেও ভালোবাসার কোনো অভাব নেই। জীবিকার টানে বাবা একসময় বিদেশে পাড়ি জমালেন। ঘরে থাকল স্ত্রী আর তিন সন্তান।

সবাই কান্নাভেজা চোখ আর ভগ্ন হৃদয়ে বিদায় দিল। বাবা বিদেশে গিয়ে থিতু হয়ে বসার পর চিঠি পাঠালেন। বড় ছেলে বলল, 'আসো, আমরা সবাই চিঠিটা একবার করে ছুঁয়ে দেখি আর চুমু দিয়ে রেখে দিই। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে ফেললে, চিঠিটার আকর্ষণ চলে যাবে।

সবাই তাই করল। এরপর চিঠিটা পরম যত্নে একটা কৌটায় রেখে দিল। বড় ছেলে কিছুদিন পরপর চিঠিটা বের করে, ঝেড়েপুছে রেখে দিত। এভাবেই চলছিল।

অনেক বছর কেটে গেল। দীর্ঘ দিন পর বাবা ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসে দেখলেন পুরো ঘর খালি। ছোট ছেলেটাই ঘরে আছে শুধু।

– তোমার আম্মু কোথায়?

– আম্মু তো দুরারোগ্য এক অসুখে ইন্তেকাল করেছেন। চিকিৎসার জন্য আমাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা ছিল না।

– কেন? তোমরা আমার প্রথম চিঠিটা খুলে দেখোনি? খামের মধ্যে তো অনেক টাকার চেক পাঠিয়েছিলাম।

– না, আব্বু।

– তোমার ভাইয়া কোথায়?

– ভাইয়া কিছু খারাপ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বখে গিয়েছিলেন। আম্মুর ইন্তেকালের পর, ভাইজানকে উপদেশ দেয়ার মতো কেউ ছিল না। এখন তিনি কোথায় আছেন কেউ জানে না।

পিতা বিস্মিত হয়ে বললেন,

– কেন? আমার পরের চিঠিটা তোমরা পড়োনি? সেটাতে তো আমি তাকে খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম। আর বলেছিলাম চিঠি পাওয়ার পরের সপ্তাহেই আমার কাছে চলে যেতে।

– জি না, আব্বু। আমরা এই চিঠিটাও না পড়েই কৌটায় রেখে দিয়েছি।

– লা হাওলা ওয়ালা কুউআতা ইল্লা বিল্লাহ।

– তোমার বোন কোথায়?

– তার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

– কার সাথে?

– আপনার কাছে যে যুবক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল, সেই যুবকের সাথে। বোনটা খুবই অশান্তিতে আছে। তার সংসারজীবন বড় কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

– ইন্না লিল্লাহ। আমার পরের চিঠিটা তোমরা পড়োনি? সেটাতে আমি কড়াভাবে নিষেধ করেছিলাম, ওই বখাটে যুবকের সঙ্গে যেন সামিনার বিয়ে না হয়।

– না আব্বু! আমরা এই চিঠিটাও যত্ন করে কৌটায় রেখে দিয়েছি।

আমাদের বাস্তবতা

আমরা কুরআনকেও ঠিক এমনি করে গিলাফবন্দী করে রেখে দিয়েছি। অথচ আল্লাহ কুরআন কারীমে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে দিয়েছেন।
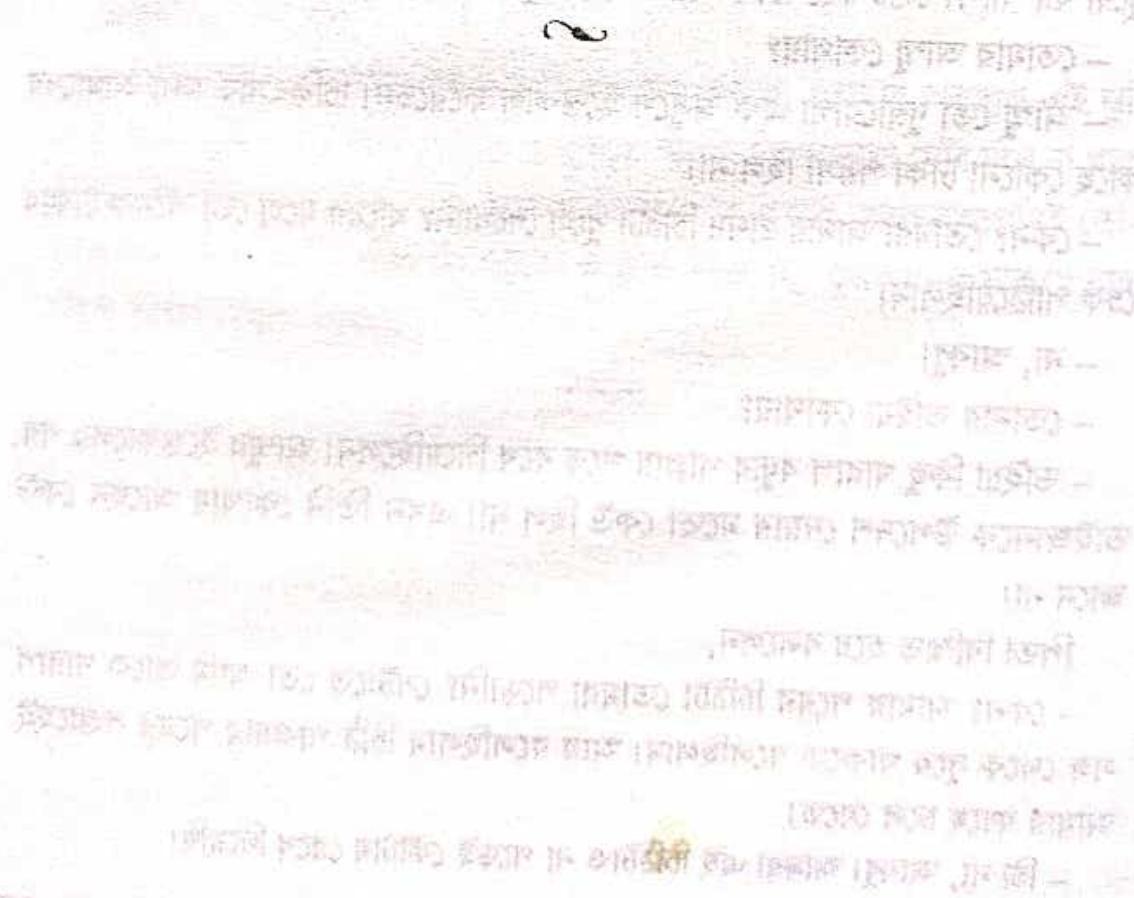
আমানতদার বয়

তাওফীক সালিম। একজন মিশরীয় বৈমানিক। বেশ কয়েক বছর ধরে কায়রো-টোকিও রুটে বিমান চালাচ্ছেন।

টোকিও এলে তিনি সবসময় রাতযাপনের জন্য হোটেল নাগাসাকিকেই বেছে নেন। হোটেলটা সম্পূর্ণ জাপানি কেতায় চলে। আরেকটা কারণ আছে, সেটা হল এই হোটেলের আয়ের বড় একটা অংশ নাগাসাকিতে আণবিক বোমায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে ব্যয় করা হয়।

গত বছর শিডিউল পরিবর্তনের কারণে, তাওফীক সালিম কিছুদিনের জন্য আগের রুটের পরিবর্তে কায়রো-সিউল রুটে বিমান চালিয়েছেন।

তিনি একটা সুন্দর গল্প শুনিয়েছেন,

– তিন মাস পর আমি আবার কায়রো-টোকিও রুটে ফিরে এলাম। স্বাভাবিকভাবেই টোকিও গিয়ে হোটেল নাগাসাকিতেই উঠলাম।

আমি হোটেলে নাম এন্ট্রি করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার নামে উচ্চৈস্বরে হাঁক দিয়ে বলল, 'মিস্টার সালিম আছেন?

অবাক হলাম। আমাকে তো এখানে কেউ চেনার কথা নয়? হাত দিয়ে ইশারা দিলাম। লোকটা আমার কাছে এল। বলল, 'এই নিন আপনার খাম।

– আমার খাম মানে?

– আপনি আগেরবার যখন এই হোটেলে উঠেছিলেন, তখন ফিরে যাওয়ার সময় এই খামটা ফেলে গিয়েছিলেন। সেদিনের রুমবয় কাউন্টারে এই খামটা জমা দিয়েছে। আমি এই হোটেলের 'লস্ট এন্ড ফাউন্ড' বিষয়ক দায়িত্বে আছি। হোটেল কর্তৃপক্ষ সেদিনের পর থেকে মিশরের কোনো বিমান এলেই আপনি আছেন কিনা সেটা খোঁজ নিয়ে আসছিল।

খামটা খুলে দেখলাম সেখানে তিনশ ডলার ভাঁজ করা আছে। মনে পড়ল, এই ডলারগুলো আমি যত্ন করে রেখেছিলাম আমার মেয়ে ফাইযার জন্য একটা জাপানি পুতুল কেনার উদ্দেশ্যে। ভেবেছিলাম, টাকাটা অন্য কোথাও হারিয়েছি। সেবার টাকা না থাকায় পুতুলটা আর কেনা হয়নি। মেয়েটা বড় মনখারাপ করেছিল।

সেদিনের বয়টাকে ডেকে এনে আমি একশ ডলার বখশিশ দিতে চাইলাম। নিল না। বলল, 'এটা আমার কর্তব্যের অংশ। এজন্য হোটেল থেকে আমি বেতন পাই। আপনার কাছ থেকে আমি টাকাটা কী হিশেবে নেব?

– আমি খুশি হয়ে তোমাকে দিতে চাচ্ছি।

– আপনি খুশি হয়েছেন সেটা আমার জন্য পরম পাওয়া; কিন্তু আমি আলাদা পুরস্কার পাওয়ার মতো কোনো কাজ করিনি।

এভাবে তাকে কিছু দিতে না পেরে, তাকে রাতের খাবারের জন্য দাওয়াত দিলাম। সে এটাও বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'এটাও এক ধরনের প্রতিদান। আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বিচক্ষণ ডাক্তার

দেশের রাজা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিলাসী। সারাক্ষণ ভোগবিলাসে মত্ত থাকেন। লাগামহীন খাওয়া-দাওয়ার কারণে রাজা ভীষণ মুটিয়ে গেলেন। নড়চড় করতে পারেন না। ঘুমুতে পারেন না। হাঁটাচলা করতে পারেন না। সারাক্ষণই হাঁসফাঁস লাগে। দরবারের কাজও অনিয়মিত হয়ে গেল। সবাই চিন্তিত। রাজা মন্ত্রী পরিষদকে ডেকে এর একটা বিহিত করতে বললেন।

সবাই পরামর্শ করে দেশের সেরা ডাক্তারকে রাজার চিকিৎসায় নিয়োগ করল। চিকিৎসায় হিতে বিপরীত হল। রাজা আরো মুটিয়ে গেলেন। আগে যাওবা দু-একটা কথা বলতে পারতেন। এখন মুখ খুললেই হাঁফিয়ে ওঠেন।

রাজার দুরবস্থার কথা শুনে এক লোক এল। চিকিৎসক বলে নিজের পরিচয় দিল। প্রধান উজির বললেন,

– তুমি সত্যি সত্যি ডাক্তার?

– জি।

– দেখ! এটা কোন খেলা নয়। রাজার জীবন-মরণ প্রশ্ন। মিথ্যা বললে কিন্তু তোমার গর্দান চলে যাবে।

– আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি ঠিক ঠিক রাজামশায়ের চিকিৎসা করতে পারব।

– তাহলে চলো।

চিকিৎসক গিয়ে রাজাকে পরীক্ষা করে দেখল। অনেক কিছু পরীক্ষা করে বলল, 'আমি একটা কথা বলতে চাই। অভয় পেলে বলতে পারি।

রাজামশায় বললেন,

– নির্ভয়ে বলো।

– জাঁহাপনা, যতদূর বুঝেছি, আপনার আয়ু আর বেশিদিন নেই। বড়জোর এক মাস আছে। এখন আপনি চাইলে চিকিৎসা শুরু করতে পারি।

– তুমি কিভাবে বুঝলে আমার আয়ু এক মাস?

– জাহাঁপনা! আমি পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছি। আপনার বিশ্বাস না হলে, আমাকে বন্দী করে রাখুন।

রাজা তাই করলেন। এরপর রাজা নির্জনবাস নিলেন। রাজার মনে সুখ নেই। শান্তি নেই। সুন্দর জীবনটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে? এত তাড়াতাড়ি মরে যাবেন? বিষয়টা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। রাজার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যতই দিন ঘনিয়ে আসছিল রাজা ততই শোকে-দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছিলেন।

আঠাশ দিনের দিন, রাজা আর থাকতে না পেরে, চিকিৎসককে জেলখানা থেকে ডেকে পাঠালেন।

– তোমার কী মনে হয়, ডাক্তার! আমি সত্যি সত্যিই দুদিন পরে মারা যাব?

– জাহাঁপনা! আমি নিজের জীবনের খবরই জানি না, অন্যের খবর কিভাবে জানব? আসলে আমার কাছে এমন রোগের কোনো ওষুধ ছিল না, যা দিয়ে চর্বি-গোশত কমানো যায়। এই রোগের ওষুধ শুধু একটাই; দুশ্চিন্তা আর শোক। আমি মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে সেই দুশ্চিন্তা আর শোকটাই সৃষ্টি করতে চেয়েছি। আলহামদু লিল্লাহ, কৌশলটা কাজে লেগেছে।

শয়তানের আট পদক্ষেপ

বনী ইসরাঈলে একজন সাধক ছিলেন। দিনরাত ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। মাসের বেশিরভাগ দিন ইতিকাফে থাকতেন। দিনে রোযা রাখতেন। দুনিয়াবিমুখ, সংসারত্যাগী, চিরকুমার। সবসময় ধর্মকর্ম নিয়েই থাকতেন।

সেই সাধকের গ্রামে তিন ভাই বাস করত। তাদের একটা বোনও ছিল। একবার কোন এক কাজে তিন ভাইকে একসঙ্গে গ্রাম ছেড়ে দূরের এক শহরে সফরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল। ভাইয়েরা বিপাকে পড়ল, বোনটাকে কোথায় রেখে যাবে? কার কাছে রেখে গেলে আদরের বোনটা নিরাপদ থাকবে? আদর-যত্নে থাকবে?

শয়তান মানুষের রূপ ধরে এসে বলল, 'তোমাদের গ্রামের সাধকের চেয়ে আর ভালো লোক কে হতে পারে? তিনি গ্রামের সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তি। বাকি সবাই তো অন্যায়-অশ্লীলতায় ডুবে আছে। তাদের কাছে তোমাদের বোন নিরাপদ থাকবে না।

ভাইয়েরা সাধকের কাছে গেল। প্রস্তাব পেশ করল, 'হুযুর, আমরা কিছুদিনে জন্য গ্রামের বাইরে যাচ্ছি। আপনি যদি দয়া করে আমাদের বোনটাকে একটু দেখেশুনে রাখতেন তাহলে অনেক উপকার হতো।'

– আস্তাগফিরুল্লাহ। নাঊযুবিল্লাহ। আমি কিভাবে একজন বেগানা মহিলাকে আশ্রয় দেব? না না, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ভাইয়েরা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেল।

প্রথম চাল

এই ফাঁকে শয়তান এল। সাধককে বলল, 'আপনি কেমন সাধক, অসহায় মানুষের সহায়তা করছেন না! একটা দুঃস্থ মেয়েকে আশ্রয় দিতে চাচ্ছেন না। এতবড় একটা সওয়াবের কাজ না করে অবহেলায় ছেড়ে দিচ্ছেন? অসহায় মেয়েটা অন্যদের কাছে থাকলে, তারা এই মেয়ের সম্মান বজায় রাখবে, বলেন? আর কোনো ভালো মানুষের কাছে থাকলেও, এতবড় একটা পুণ্যের কাজ অন্যের জন্য কেন ফেলে রাখবেন? আপনি রাজি হয়ে যান। ভাইদের কাছে শর্ত দিন, তারা যেন বোনের জন্য গির্জার পাশেই আলাদা একটা দোচালা ঘর বেঁধে দেয়।'

ব্যস! মেয়ের জায়গায় মেয়ে থাকবে, আপনার জায়গায় আপনি থাকবেন। কোনো সমস্যা হবে না।

শয়তান এবার গিয়ে ভাইদের বলল, 'তোমরা আবার গিয়ে সাধককে কাকুতি-মিনতি করে বলো। তিনি রাজি হয়ে যাবেন।'

সাধক রাজি হলেন। ভাইয়েরা সব ব্যবস্থা করে বোনকে রেখে চলে গেল। সাধক প্রতিদিন খাবার এনে দরজার সামনে রেখে যেতেন। গির্জার সামনে গিয়ে দরজা বরাবর একটা ঢিল ছুঁড়ে জানান দিতেন যে, তিনি খাবার দিয়ে গেছেন। এরপর নিজ ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে পড়তেন। মেয়েটি ঢিলের আওয়াজ শুনে খাবার সংগ্রহ করত।

❖ দ্বিতীয় চাল

এভাবে কিছুদিন গেল। একদিন শয়তান এসে বলল, 'এই যুবতী আপনার কাছে আমানতস্বরূপ। আপনি তার কামরার সামনে খাবার রেখে আসেন। আপনি চলে আসার পর, মেয়েটা বের হয়ে খাবার নিয়ে যায়। তখন গ্রামের পুরুষরা তাকে দেখে। অনেকেই মেয়েটাকে এক নজর দেখার জন্য, এই সময়টাতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি এবার থেকে খাবারটা কামরার ভেতরে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

শয়তানের কথাটা সাধকের মনে ধরল। এরপর সাধক যখন খাবার দিতে গেলেন, খাবারটা ভেতরে রাখতে গিয়ে অজান্তেই তার চোখের দৃষ্টি যুবতীটির ওপর পড়ল। সাধক ইস্তিগফার পড়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। শয়তান যুবতীটিকে সাধকের দৃষ্টিতে আরো সুন্দর করে দেখাল। সাধক নাউযুবিল্লাহ পড়ে চোখ নামিয়ে দ্রুত চলে এলেন। এভাবে কিছুদিন গেল।

❖ তৃতীয় চাল

একদিন শয়তান এসে বলল, 'বেচারি এতিম! ছোটবেলাতেই মা-বাবা মারা গেছেন। ভাইদের হাতে মানুষ হয়েছে। এখন ভাইয়েরা কেউ কাছে-পিঠে নেই। সারাদিন একা একা থাকে। একাকী, নিঃসঙ্গ। কথা বলারও কেউ নেই। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। আপনি যদি মাঝেমধ্যে দরজার বাইরে গিয়ে বসতেন। দু-চারটা কথা বলে সান্ত্বনা দিতেন, অসহায় মেয়েটার ভালো লাগত। সে তো ধর্মের শিক্ষাও পায়নি। ফাঁকে ফাঁকে যদি আপনি কিছু ধর্মের কথাও শুনিয়ে দেন তাহলে বেচারি ভালো কিছু শিক্ষাও পেয়ে গেল।'

শয়তানের প্রস্তাবটা সাধকের মনে ধরল। তাই তো! দরজার বাইরে বসে চার-পাঁচটা ধর্মের কথা শোনালে পুণ্য ছাড়া আর কিইবা হতে পারে!

এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। কথা বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে, একে অপরের প্রতি এক ধরনের টান সৃষ্টি হল।

ঃ চতুর্থ চাল

একদিন শয়তান এসে বলল, 'এভাবে দরজা বন্ধ করে কথা বললে, কথার প্রভাব থাকে না। বক্তা আর শ্রোতা একে অপরকে না দেখলে সে কথার মূল্যই-বা কি? আপনি সামনাসামনি যদি তাকে উপদেশ দেন তাহলে সে আরও ভালো ধার্মিক হতে পারবে। দরজা খুলে কথা বলুন।'

আবিদ মেনে নিলেন। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর, দুজনের মনের টানটা দুর্নিবার আকর্ষণে পরিণত হল।

ঃ পঞ্চম চাল

এবার শয়তান এসে বলল, 'আপনাদেরকে এভাবে কথা বলতে দেখে তো গ্রামে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা আপনাদের দুজনকেই দেখতে পাচ্ছে। আপনি এক কাজ করুন, কামরার ভেতরে গিয়েই কথা বলুন। দরজা খোলা থাকলে কেউ কিছু মনে করবে না। সাধক মেনে নিলেন। এভাবে কিছুদিন গেল। কাছাকাছি এসে কথা বলাতে, দুজনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের চিন্তা ও ইচ্ছা জন্ম নিতে শুরু করল।'

ঃ ষষ্ঠ চাল

শয়তান আবার এল। সাধককে বলল, 'আপনারা যেভাবে কথা বলছেন, হঠাৎ কেউ এসে পড়লে খারাপ ধারণা করতে পারে। তার চেয়ে বরং দরজাটা বন্ধ করে নিন। তাহলে ভেতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে বাইরে থেকে দেখা যাবে না।'

কিছুদিন পর যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে পড়ল। সাধক ভয় পেয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

ঃ সপ্তম চাল

শয়তান এসে বলল, 'মেয়ের ভাইয়েরা ফিরে এলে কী জবাব দেবেন? তারা তো আপনাকে নির্ঘাত হত্যা করবে।'

– এ বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কী?

– উপায় তো একটাই, আপনি মেয়েটাকে মেরে ফেলুন।

সাধক দ্বিধায় পড়ে গেল। অনেক চিন্তা করল। আর কোনো বিকল্প না দেখে শয়তানের কথা মেনে নিল।

সেই কামরার ভেতরেই যুবতীটিকে দাফন করে দিল। তারপর গির্জার বাইরে একটা কাল্পনিক কবর খুঁড়ে, মাটি দিয়ে ভরাট করে রেখে দিল।

কিছুদিন পর ভাইয়েরা বিদেশ থেকে ফিরে এল। সাধক কাঁদতে কাঁদতে ভাইদের অভ্যর্থনা জানাল। তাদের বলল, 'তোমাদের বোন বড়ই ভালো মেয়ে ছিল। কিছুদিন আগে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

একমাত্র বোনের মৃত্যুতে ভাইয়েরা ভীষণ শোকাহত হল। তার কবরে গিয়ে দুআ করল। আবিদ ভাবল, ব্যাপারটা এখানেই চুকে গেছে; কিন্তু শয়তান তো ভোলেনি।

এক রাতে শয়তান তিন ভাইয়ের সবাইকে একসঙ্গে স্বপ্নে দেখাল, 'তোমাদের বোন অসুখে মরেনি, সাধক তাকে মেরে ফেলেছে। বিশ্বাস না হলে, তার কক্ষে গিয়ে দেখো। সেখানেই তাকে কবর দেয়া হয়েছে। তোমাদেরকে যে কবর দেখানো হয়েছে সেটা ভুয়া।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাইয়েরা একে অপরকে বলল, স্বপ্নে কী দেখেছে। সবার স্বপ্ন মিলে গেল। তারা সেই কামরায় গিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখল ঘটনা সত্য। তারপর আবিদকে ধরে আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে কোর্টে চালান দিল। বিচারক ফাঁসির হুকুম দিলেন।

আখেরি চাল

জল্লাদ এসে সাধককে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল। এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক এসে সাধককে বলল, 'আমাকে চিনতে পারো?'

– না তো, তুমি কে?

– আমি হলাম সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমি চাইলে তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি।

– আমাকে বাঁচান। আমাকে বাঁচান। আপনি যা চান, তাই দেব।

– বাঁচতে হলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

– কী কাজ?

– আমাকে সিজদা করতে হবে।

সাধক তৎক্ষণাৎ সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। এর পরপরই জল্লাদ এসে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল। সাধক কাফির হয়ে মারা গেল।

« হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের অনুসরণ করলে, সে (শয়তান)-তো অশ্লীল ও মন্দ কাজেরই আদেশ করে থাকে। »
[সূরা নূর, ২৪:২১]

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

১৮৮৪ সাল। বোস্টন রেলস্টেশন। কয়লার ইঞ্জিনচালিত একটা ট্রেন এসে থামল। কু-উ-ঝিকঝিক করে। ট্রেন থেকে নামল একটি দম্পতি। আটপৌরে পোশাকাশাক। আধময়লা আর খসখসে। নিজ হাতে বোনা।

স্বামী-স্ত্রী মিলে হার্ভাড ইউনিভার্সিটিতে গেলেন। খুঁজে খুঁজে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে আসলেন। পি এস-কে বললেন,

— আমরা ভিসি-র সঙ্গে সামান্য দেখা করতে চাই। দুঃখিত, আগে থেকে সময় নিয়ে আসতে পারিনি।

প্রাইভেট সেক্রেটারি সামনে দাঁড়ানো দম্পতির আপাদমস্তক মেপে দেখল। বুঝতে পারল না, ভিসির সঙ্গে এই গেঁয়ো বুড়ো-বুড়ির কী প্রয়োজন! মুখের ওপর বলে দিল,

— ভিসি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। তাঁর অবসর হতে সময় লাগবে।

বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে বললেন,

— কোনো সমস্যা নেই। আমরা অপেক্ষা করবো।

দুজনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সেক্রেটারির পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মিলল না। সেক্রেটারি যেন তাদের দুজনের উপস্থিতিই ভুলে গেল।

সেক্রেটারি ভেবেছিল, বুড়োবুড়ি কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে চলে যাবে। তা হয়নি দেখে বিরক্ত হল। বুড়োবুড়ির বারবার তাগাদায় সে অতিষ্ঠ হয়ে গেল। শেষে রেগেমেগে ভিসির সঙ্গে কথা বলতে গেল। ভিসিও বিরক্ত হলেন। উটকো ঝামেলা মনে করে বললেন,

— ঠিক আছে। সামান্য সময়ের কথা বলে নিয়ে এসো।

বুড়োবুড়িকে দেখে ভিসির চোয়াল ঝুলে পড়ল। এই দুই কৃষক-কৃষাণীর তার কাছে কী প্রয়োজন থাকতে পারে বুঝতে পারলেন না। নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে চেয়ারে বসতে দিলেন।

— বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি? সংক্ষেপে বলুন।

— আমাদের ছেলেটা এই ভার্সিটিতে পড়ত। কিছুদিন আগে এক দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে।

— তো, এখন আমি কী করতে পারি?

– ছেলেটা এই ভার্সিটিতে পড়ার সময়টাতে তার জীবনটা খুবই আনন্দে কেটেছিল। তার জীবনের সেরা সময় ছিল হার্ভার্ডের দিনগুলো। আমরা চাই আমাদের ছেলের স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু করতে। ভার্সিটির কোথাও তার একটা ভাস্কর্য স্থাপন করতে চাই। সেজন্য আমরা ভার্সিটির ফান্ডে বাড়তি ডোনেশন দিতেও রাজি আছি। এছাড়া নির্মাণ বাবদ সমস্ত ব্যয় আমরাই বহন করব।

ভিসি রুক্ষস্বরে জবাব দিলেন,

– এখানে পড়ালেখা করে যত ছাত্র মারা গেছে, তাদের সবার স্মৃতি রক্ষা করার নামে যদি মূর্তি আর ভাস্কর্য তৈরি করি, তাহলে তো এটা ভার্সিটি থাকবে না। মূর্তি-ভাস্কর্যের জঙ্গলে পরিণত হবে। এসব কিছু এখানে চলবে না। আপনারা এখন আসতে পারেন।

– না না, স্যার! আমরা কোনো ভাস্কর্য বা মূর্তির কথা বলছি না। আমরা বলছিলাম কি, আমাদের সন্তানের নামে একটা ভবন নির্মাণ করা গেলে ভালো হত।

একথা শুনে ভিসি বাঁকা হেসে বললেন,

– আপনাদের হুঁশ ঠিক আছে তো? জানেন একটা ভবন তৈরিতে কত খরচ পড়বে? আমাদের সর্বশেষ ভবন নির্মাণে খরচ পড়েছিল প্রায় সাড়ে সাত মিলিয়ন ডলার। পারবেন এত টাকার যোগান দিতে?

কামরায় নিরবতা নেমে এল। ভিসি ভাবলেন, এবার এই দুই জুজু বুড়োবুড়ি থেকে মুক্তি পাবেন; কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বৃদ্ধা তার স্বামীর দিকে ফিরে, অনুচ্চস্বরে বললেন,

– মিস্টার স্ট্যামফোর্ড! হার্ভার্ডে একটা ভবন নির্মাণ করতে যে খরচ পড়বে, সেটা দিয়ে তো আমাদের শহরে গোটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আমরা এখানে ছেলের নামে একটা ভবন নির্মাণ না করে, তার নামে গোটা একটা ভার্সিটিই তো প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে পারি। তোমার কী মনে হয়?

– ঠিক বলেছ, জেন!

ভিসিকে হতবাক অবস্থায় রেখে, বুড়োবুড়ি কামরা ছেড়ে বের হয়ে গেল।

স্যার লেল্যান্ড স্ট্যামফোর্ড আর মিসেস জেন স্ট্যামফোর্ড বোস্টন ছেড়ে চলে এলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে। নিজেদের শহর ক্যালিফোর্নিয়াতে। কিছুদিন পরেই তারা প্রতিষ্ঠা করলেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি। যা তাদের ছেলের স্মৃতি বহন করছে। পরিবারের কীর্তি ঘোষণা করছে। এই ভার্সিটি এখন বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। এই নামে সারা বিশ্বের অনেকগুলো দেশে শাখা খোলা হয়েছে।

অপূর্ব বিশ্বস্ততা

তিনজন লোক এক যুবককে বেঁধে রাজদরবারে হাজির হল। তাদের অভিযোগ,

– জাঁহাপনা! এ যুবক আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে।

রাজা যুবকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

– কেন তুমি তাদের পিতাকে হত্যা করেছ?

– জাহাঁপনা! আমি একজন রাখাল। আমার একটা মেষ দলছুট হয়ে ওদের পিতার ফসলি জমিতে মুখ দিয়েছিল। ওদের পিতা তখন পাথর ছুঁড়ে আমার মেষটাকে মেরে ফেলেছেন। তখন আমি ছুটে গিয়ে সে পাথরটা তাদের পিতার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। সে পাথরের আঘাতে তিনি মারা গেছেন।

– তাহলে তো তুমি দোষী। তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

– জাহাঁপনা! আমার কৃত অন্যায়ের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব; তবে শুধু তিনটা দিন সময় চাই।

– কেন?

– আমার বাবা-মা নেই। ঘরে ছোট একটা ভাই আছে। আব্বু মারা যাওয়ার সময় আমাদের দুই ভাইয়ের জন্য কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। আমি সেগুলো গোপন এক স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। আমি মারা গেলে ওই টাকা আমার ছোট ভাই কখনই খুঁজে পাবে না। কথা দিচ্ছি, কাজটা শেষ করেই ফিরে আসব।

– এমনি এমনি তো ছেড়ে দেয়া যাবে না। তোমার জন্য কাউকে জামিন হতে হবে। কেউ কি আছ, এই রাখাল যুবকের জন্য তিনদিনের জামিন হবে? একজন লোক হাত তুলল। রাজা বললেন,

– তুমি বুঝেশুনে জামিন হচ্ছ তো? রাখাল যুবক ফিরে না এলে কিন্তু তোমাকেই হত্যা করা হবে।

তৃতীয় দিন, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। আসরের ওয়াক্ত যাই যাই করছে। লোকজন অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। রাখাল যুবকের দেখা নেই। মাগরিবের সময় প্রায় হয়ে এল।

এদিকে জল্লাদ জামিন হওয়া লোকটাকে বেঁধে ফেলেছে। হত্যা করার যাবতীয় কার্যক্রম প্রস্তুত। এমন সময় দূর-দিগন্তে একজন লোককে ছুটে আসতে দেখা গেল। চিৎকার ভেসে এল,

– থামুন! থামুন! আমি হাজির। আমি হাজির।

রাজা অবাক হয়ে রাখালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন ফিরে এলে? ইচ্ছে করলে না-ও আসতে পারতে!'

– ফিরে এসেছি। কারণ যদি না আসতাম সবাই বলাবলি করত, মানুষের মাঝে আগের মতো আর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার মানসিকতা নেই।

রাজা এবার জামিন হওয়া লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন,

– তুমি কেন জামিন হয়েছিলে?

– আমি আশংকা করলাম আমি জামিন না হলে লোকেরা বলবে, দেশে ভালো কাজ করার মতো মানুষের বড় অভাব।

এসব দেখে নিহত ব্যক্তির ছেলেরা প্রভাবিত হল। তারা বলল, 'আমরা রাখাল যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছি।

রাজা জানতে চাইলেন,

– কেন?

– পাছে লোকেরা আবার বলে না বসে, দেশ থেকে ক্ষমা-মার্জনা উঠে গেছে।

আমরা গল্পটা শোনালাম, পাছে আবার কেউ বলে না বসে, সমাজে ভালো কাজের কথা বলার মতো কেউ নেই!

বুড়ির উপদেশ

রাজা নগরপরিক্রমায় বের হয়েছেন। ছদ্মবেশ ধরে। সঙ্গে আছেন উজির। নানা পথ ঘুরে ফিরে দেখছেন প্রজাদের অবস্থা। হাঁটতে হাঁটতে শহরের প্রান্তে চলে এলেন। একটা ঘর থেকে টিমটিমে আলো আসছিল। কুপির আলো। দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে কফস্বর ভেসে এল,

– কে?

– আমরা মুসাফির!

ধীরে ধীরে দরজা খানিকটা ফাঁক হল। কপাট ফুঁড়ে উঁকি দিল ষাটোর্দ্ধা এক মহাকালের সাক্ষী। সরু চোখে খানিক তাকিয়ে ইশারায় বলল, 'ভেতরে এসে বসো!

বুড়ি দক্ষ হাতে সামান্য খাবার হাজির করল। বাছারা, আমার কাছে বেশি কিছু নেই। যা আছে চুপটি করে খেয়ে নাও। দূরদেশ থেকে এসেছ! ক্ষিধে পেয়েছে, সে তোমাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তবে আমার ঘরে শোয়ার আয়োজন তেমন নেই।

– না না বুড়িমা! আমাদের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। আপনি যেটুকু করেছেন তাতেই আমরা বর্তে গেছি। একটু বিশ্রাম করেই আমরা চলে যাব। দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই একটু জিরোতে এসেছি।

এবার বিদায় নেওয়ার পালা। রাজা মুঠো ভরে মোহর দিলেন বুড়িমাকে। সোনার মোহর পেয়ে বুড়ির মুখে হাসি আর ধরে না। প্রাণভরে দুআ করল অচেনা পথিক দুজনের জন্যে। রাজা বললেন,

– শুধু দুআ নয়, আরও কিছু চাই!

– আর কী দেবো!

– যাবার বেলায় আমাদের কিছু উপদেশ দিন!

– তোমরা দশদিক ঘুরে বেড়াও, আমার উপদেশ দিয়ে কী করবে? তবুও বলছি শোন। তিনটা উপদেশ দিচ্ছি।

- কখনো রাজাকে বিশ্বাস করবে না। তোমাকে আদর করে সোনার মুকুট পরিয়ে দিলেও না।

- নারীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না। শ্রদ্ধার ভারে তোমাকে সিজদা করতে শুরু করলেও না।

- নিজের পরিবারের প্রতি আস্থা রাখবে। একদম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও বিশ্বাস হারাবে না।

রাজা আবার মুঠো ভরে পুরস্কার দিলেন। পথে নেমে কিছুদূর পথ চলার পর মুখ খুললেন।

– বুড়ির উপদেশগুলো পুরোপুরি মেনে নেয়ার মতো নয়! কেমন যেন!

উজির কিছু না বলে চুপ করে থাকল। উপদেশগুলো তার বেশ মনে ধরেছে। এখন রাজাকে কিভাবে বিশ্বাস করানো যায়? রাজাকে প্রাসাদে পৌঁছে দিলেন। নিজ গৃহে ফেরার পথে, রাজপ্রাসাদ থেকে একটা বুলবুলি নিয়ে এলেন। কেউ না দেখে মতো করে। পাখিটা রাজার বেজায় প্রিয়। ঘরে এসে পতণীকে বললেন,

– বেগম! বুলবুলিটা সযত্নে রাখবে। বহুত দামী পাখি। খবরদার! না পালায় যেন! এটার কথা কাকপক্ষীও যেন টের না পায়!

সপ্তাহখানেক পর, উজির স্ত্রীকে বললেন:

– বিয়ের সময় আম্মু তোমাকে একটা হার দিয়েছিলেন না?

– জি!

– ওটা একটু দাও! এক হীরে ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা হয়েছে। সে নাকি পুরনো হার সুন্দর নকশায় নতুন করে গড়ে দিতে পারে!

– ও মা, তাই? এই নাও!

কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরও হারটা নিয়ে না আসায় স্ত্রী বলল:

– হারটার কী খবর? মেরামত হয়েছে?

উজির কথাটা না শোনার ভান করলেন। পাশ কাটিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আরও কয়েকদিন হারের কথা পাড়ার পরও স্বামী ভ্রুক্ষেপ না করায়, স্ত্রীর মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল। নিশ্চয় অন্য কাউকে দিয়ে ফেলেছে। হায় হায় আমার বিয়ের হার! গোপনে গোপনে আরেক বিয়ে করে ফেলেনি তো! হতেও পারে! নইলে এমন লুকোছাপা কেন? এবার সরাসরি স্বামীর মুখের উপরই বলে দিল,

– আপনি হারটা কাকে দিয়েছেন আমি জানি!

উজির এবারও মুখ খুললেন না। নিরুত্তর রইলেন। স্ত্রীর এবার আর কোন সন্দেহই রইল না। তার মনে ভীষণ আক্রোশ জন্ম নিল। মনে মনে স্বামীকে জব্দ করার উপায় খুঁজতে লাগল। পথ বের হতে দেরি হল না। স্ত্রী একদিন সুযোগ বুঝে রাজদরবারে গেল। রানিকে ধরে সোজা রাজার সঙ্গে দেখা করল।

– জাহাঁপনা! এই নিন আপনার হারানো বুলবুলি! আমার স্বামী এটা প্রাসাদ থেকে সরিয়ে ফেলেছে!

রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। এতদিন ধরে বুলবুলিটার শোকে মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। কাছের লোকই এই কাণ্ড ঘটাল? ঠিক আছে দেখাচ্ছি মজা! উপরে সাধু সেজে তলে তলে এই!

– উজির-বেগম! তোমার এই বিশ্বস্ততায় আমি ভীষণ খুশি হয়েছি! আমি বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে নিই। তারপর তোমাকে উপযুক্ত ইনাম দেব! এখন ঘরে চলে যাও!

উজিরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল। সরাসরি ফাঁসির হুকুম দিলেন। প্রাসাদের সামনে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হল। উজিরকে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে হাজির করা হল। রাজা স্বয়ং উপস্থিত হলেন। ছেলের এহেন করুণ পরিণতির কথা শুনে, উজিরের বৃদ্ধ পিতা ও ভাইয়েরা কাঁদতে কাঁদতে হাজির হল। রাজার সিংহাসনের কাছে লুটিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন পিতা। তবুও রাজার মন গলল না। উজিরের বৃদ্ধ পিতা ছেলের মুক্তির বিনিময়ে নিজেকে ফাঁসির মঞ্চে পেশ করার কথাও বললেন। রাজা আপন সিদ্ধান্তে অটল।

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। উজিরকে যমটুপি পরানো হল। শেষ ইচ্ছার কথা জানতে চাওয়া হল।

– আমি জাহাঁপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই!

– বলো!

উজির বুলবুলি থেকে শুরু করে হার পর্যন্ত পুরো ঘটনার নেপথ্য কারণ খুলে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমার তিন উপদেশের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। রাজা বুঝতে পারলেন, তাকে বাস্তবতা বোঝানোর জন্যেই উজির এত বড় ঝুঁকি নিয়েছে। তার উপকারের জন্যেই এতকিছু করেছে। এমন একটা মানুষকে তিনি ফাঁসি দিতে উদ্যত হলেন! প্রথম উপদেশটা মনে পড়তেই রাজা লজ্জায় অধোবদন হয়ে পড়লেন।

উত্তরাধিকার আইন

ড. যিয়াদ ইরাব। কায়রো ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদের ডিন। তিনি বলেন,

– আমরা সেবার হল্যান্ডের হেগ শহরে গেলাম। সারা বিশ্বের আইন বিশারদগণ একত্র হয়েছেন। আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক একটা সেমিনার উপলক্ষে। সেমিনারে আমার পেপার উপস্থাপন করলাম। সেমিনার শেষে একটা ক্যাফেটোরিয়াতে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম। এমন সময় আরো কয়েকজন প্রফেসর এসে যোগ দিলেন।

তাদের মধ্যে ছিল প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ড. ডেভিড গাওয়ার। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুরু হল।

একথা সেকথার পর আমাদের আলোচনা এসে ঠেকল ইসলামি উত্তরাধিকার-আইনে। তারা ইসলামি শরীয়াহর কড়া সমালোচনা শুরু করে দিল। আমি তাদেরকে উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিলাম।

ড. ডেভিড কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমাদের তালমুদের মতো এত সুন্দর বণ্টনব্যবস্থা আর কোথাও নেই।

আমি তার কথার খেই ধরে বললাম,

– আপনাদের তালমুদে এ বিষয়ক আলোচনা কতটুকু আছে?

– এই ধরুন বড় বড় দুটো ভলিউমে!

– ড. ডেভিড, মার্কিন উত্তরাধিকার-আইন বিষয়ে আপনি জানেন?

– হ্যাঁ, জানি। আমি তো সেটাই পড়াই।

– সেটার বিরবণ কয়টা বইয়ে লেখা আছে?

– এই ধরুন, বড় বড় আটটা ভলিউমে!

আমি তখন বললাম,

– আমি যদি আপনাকে মাত্র পনের কি বিশ লাইনের মধ্যেই পুরো উত্তরাধিকার-আইন পেশ করি আপনি কি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করবেন?

– অসম্ভব! এত অল্প কথায় এমন জটিল একটা বিষয় প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমি তখন সূরা নিসার এগার-বারো আর শেষ আয়াতের অনুবাদ তাকে পড়ে শোনালাম।

ড. ডেভিড চুপ হয়ে গেলেন। বললেন,

– বিষয়টা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে।

দুদিন পর আরেকটা সেশনে আমাদের দেখা হল। ড. ডেভিড আমাকে দেখে নিজ থেকেই এগিয়ে এসে যেচে কথা বললেন।

– ড. ইরাব! আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, এত অল্প পরিসরে পুরো একটা ধর্মের উত্তরাধিকার আইন বর্ণনা করা সম্ভব! এটা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ এত সুন্দর করে, এমন ভারসাম্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা কল্পনাতীত বিষয়। শুধু একটা বিষয়ে খটকা লেগেছে, নারীদের প্রতি কেন বৈষম্য করা হয়েছে? একজন নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পাবে, এটা কেমন দেখায় না?

আমি বললাম,

– ইসলামে নারীর ওপর জীবিকার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার পুরুষকেই বহন করতে হবে। এমনকি একজন মা যদি চান, সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে মজুরি নেবেন, সেটাও ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে; বরং স্বামীকে বাধ্য করে।

তারপরও ইসলাম নারীকে বঞ্চিত করেনি। একজন নারী বিভিন্ন দিক থেকে যে উত্তরাধিকার সম্পদ লাভ করে, সব মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় তার প্রাপ্য অংশ পুরুষের চেয়ে কোনো দিক থেকে কম নয়।

আমি আরও বিস্তারিতভাবে তাকে বোঝালাম। তিনিও অনেক তর্ক করলেন। প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, আমি সুন্দরভাবে সেগুলোর উত্তর দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলাম।

ড. ডেভিড বিষয়টা নিয়ে আরো ভাববেন বলে বিদায় নিলেন।

অন্তরালের অন্তরায়

সকাল বেলা। অফিসের সময়। বিরাট বড় কোম্পানির প্রধান কার্যালয়। একে একে কমকর্তারা আসতে শুরু করল।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, অফিসঘরের মূল দরজাটা বন্ধ। দরজার ওপর একটা কাঠের ফলক ঝোলানো আছে। তাতে লেখা,

> গত রাতে এমন ব্যক্তি মারা গেছে, যে এই কোম্পানিতে সবার উন্নতি-অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়েছিল। সম্মেলন কক্ষে কফিন রাখা আছে। আশা করি সবাই শোক নিবেদন করে আসবেন।
>
> – কর্তৃপক্ষ

কোনো সহকর্মী মারা গেছে ভেবে, সবাই শোকাহত হল। পাশাপাশি খুশিও হল, পথের কাঁটা দূর হয়েছে। এতদিন এই বেটার কারণেই, কোম্পানিতে তাদের প্রমোশন আটকে ছিল। এই ব্যাটাই তাদের কর্মক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছিল। এখন জানা যাবে, কে সেই লোক (কালপ্রিট) যার কারণে তারা এতদিন পিছিয়ে ছিল। শত চেষ্টা-তদবির করেও কাজ হয়নি।

সবাই লাশ দেখতে গেল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের দরজায় কর্তব্যরত প্রহরী সবাইকে বাধা দিল। বলল, 'কর্তৃপক্ষের আদেশ, একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি মরদেহ দেখার জন্য যেতে পারবে না। একজন একজন করে যেতে হবে।

প্রথম ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে কফিনঘরে প্রবেশ করল। এত বড় ঘরে একা যেতে ভয় ভয় করছিল। গা ছমছম করছিল। কফিনের ডালা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। যা দেখল, সেটা দেখবে বলে সে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি। দেখল, কফিনের ভেতরে কোন লাশ নেই। সেখানে একটা আয়না রাখা আছে। হঠাৎ ক্লিক করে একটা আওয়াজ হল। তারপরই আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠল। আলোর কারসাজিতে তাকে একটা মরদেহের মতোই দেখা যাচ্ছে। এরপর নিয়নসাইনের মতো একটা লেখা ফুটে উঠল,

> এই পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষই আছে যে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারে। সে ব্যক্তি হল 'তুমি'।
>
> তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সহকর্মী

বা তোমার বদমেজাজি বস

বা তোমার কুচুটে বন্ধু

বা তোমার মুখরা স্ত্রী

বা তোমার কোম্পানি

বা তোমার কর্মক্ষেত্র

বা তোমার বাহ্যিক জীবন বদলে গেলেই যে তোমার জীবনের বদলে যাবে, এমন নয়। তোমার জীবন ঠিক তখনই বদলাবে, যখন তুমি নিজেই বদলাবে। যখন তুমি তোমার নির্ধারণ করা সীমায় দাঁড়াবে। সুকঠিন কাজ, ক্ষতি-লোকসান, অসম্ভব লক্ষ্য কিছুকেই ভয় করবে না। তোমার ব্যক্তিত্ব গভীরভাবে লক্ষ্য করো। নিজের শক্তি-সামর্থের ওপর ভরসা রাখো। আপন শক্তিকে পুঁজি করেই এখন থেকে সংগ্রাম-সাধনা শুরু করে দাও। সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবেই করবে।

জীবনকথা

প্রতিবারের মতো এবারও অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ফি বছরই এমন হয়। বিদায়ী বর্ষের ছাত্ররা স্মৃতিচারণ করে। নতুনদেরও কেউ কেউ তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন বড় ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া হয়। তিনি নিজের জীবনকথা বলেন। ছাত্রদের উদ্দেশে উৎসাহ ও প্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। এবারও ব্যতিক্রম হল না। প্রধান অতিথি মঞ্চে উঠলেন। কোনোরকম ভূমিকা না করেই কথা শুরু করলেন। একান্ত আপন ভঙ্গিতে।

আমি শুধু একটা ঘটনা বলেই বিদায় নেব। আমার জীবন থেকে নেওয়া। বলতে গেলে আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়া ঘটনা।

তখন আমার বার্ষিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। বাড়িতে বলেছি প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় করতে। আমি গরিব ঘরের সন্তান। বাবা ছিলেন একটা মুদি দোকানের কর্মচারী। মহাজনের কাছ থেকে ধার করে আমার পরীক্ষার টাকা যোগাড় করলেন। আল্লাহর ইচ্ছা! তিনি কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে রাতে ঘুমিয়ে, আর জাগলেন না। পরদিন ছিল জুমাবার। শনিবার টাকা জমা দেয়ার শেষ তারিখ। পরীক্ষার টাকা আব্বার কাফন-দাফনেই চলে গেছে। হাতে আর কোনো টাকা নেই। পড়ালেখা আর করব না, এমনটাই ঠিক করে ফেললাম।

মনটা ভীষণ খারাপ। একদিনের মধ্যেই জীবনের হিশেব-নিকেশ কেমন বদলে গেল। তারপরও মনে হচ্ছিল একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটবে। আল্লাহ আমার জন্যে আকাশ থেকে টাকা পাঠিয়ে দেবেন। বিপদের সময় এমন চিন্তা অনেকেরই আসে। আব্বুকে কবর দিতে দিতে জুমার সময় হয়ে গেল। মসজিদে গিয়ে দুরাকাত নামায পড়লাম। আল্লাহর কাছে আমার অভাবের কথা, চাহিদার কথা কায়মনোবাক্যে বললাম।

আগে আগে মসজিদে চলে এসেছিলাম। তাই সামনের কাতারে স্থান পেয়েছিলাম। আব্বুর কারণে মনটা আগের চেয়ে বেশি আল্লাহমুখী ছিল। নামায শেষ করার পর চুপচাপ বসে আছি। সুন্নাত পড়ে আল্লাহর কাছে খুব করে বললাম। দুআ শেষ করে উদাস মনে বসে রইলাম। ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। পাশেই একলোক বসে ছিলেন। নামাযের আগ থেকেই ছিলেন। মৃদুস্বরে জানতে চাইলেন, 'তোমার কি কোনো সমস্যা আছে? মুখটা মলিন দেখাচ্ছে! কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারো! লজ্জার কিছু নেই।'

— গতরাতে আমার আব্বু ইন্তেকাল করেছেন!
— ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।
— তোমার পরিবারে কি উনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন?
— জি। আমি পরিবারের বড় ছেলে।
— পরিবার চলার মতো খরচাপাতি আছে?
— জি না। আগামীকাল আমার বার্ষিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেয়ার শেষ দিন। ওই টাকার কোনো ব্যবস্থা নেই!
— ঠিক আছে। কোনো চিন্তা কোরো না। তোমার লেখাপড়া বাবদ যা খরচা লাগে আমি দিয়ে দেব। তুমি শুধু স্কুলের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও! আগামীকাল সময় মতো স্কুলে থাকবে!

আজ আমি এতদূর এসেছি। সে মহান মানুষটার বদান্যতা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। আমি নানাভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছি। তার বিভিন্ন কাজ করে দিতে চেয়েছি। প্রতিবারই তিনি বলতেন,

— আগে লেখাপড়া শেষ কোরো, তারপর দেখা যাবে!

লেখাপড়া শেষ করলাম। তার কাছে গেলাম। তার ঋণ পরিশোধের একটা সুযোগ দিতে বললাম। তিনি বললেন,

— কোথাও একটা চাকুরি জুটিয়ে তারপর এসো!

সামান্য চেষ্টাতেই ভাল একটা চাকুরি পেয়ে গেলাম। বেতন যা দেবে, তাতে আমাদের পরিবারের খরচ উঠে আরও উদ্বৃত্ত টাকা থেকে যাবে। সময় করে আবার মহান মানুষটার কাছে গেলাম।

— এবার আর ফেরাতে পারবেন না! কিভাবে কী করতে পারি?
— তুমি একটা কাজ করবে! যতদিন তোমার তাওফীকে কুলায়, প্রতি জুমাবারে নামায শেষ করে মসজিদে বসে থাকবে। খেয়াল রাখবে কোন অভাবী ও দুঃখী মানুষ চোখে পড়ে কি-না। এমন কাউকে পেলে, তুমিও তার প্রয়োজন পুরো করার চেষ্টা করো! তাহলেই আমার ঋণ শোধ হয়ে যাবে!

প্রিয় ছাত্ররা! সেদিন থেকে তাই করে আসছি। প্রতি জুমাবারেই আমি চেষ্টা করি কিছু করতে। দুঃখী মানুষের সেবা করতে। আমার আজীবনের ঋণ শোধ করতে।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

পিতা-পুত্র মিলে দেশভ্রমণে বের হয়েছেন। প্রথমে গেলেন একটা গরিব দেশে। পিতার ইচ্ছা, ফকির-দরিদ্ররা কীভাবে জীবন-যাপন করে, ছেলে তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

তারা দেশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ফিরে দেখলেন। পিতা-পুত্র মিলে অতি দরিদ্র একটা পরিবারে কিছুদিন থাকলেন। একদম কাছ থেকে দেখলেন, কিভাবে গরিব মানুষ বসবাস করে। দেখা শেষ। এবার ফেরার পালা। বাবা জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে,

– ভ্রমণটা কেমন হল?

– এককথায় দারুণ!

– তুমি কি মনোযোগ দিয়ে দেখেছো, গরিব মানুষ কীভাবে জীবন-যাপন করে? কীভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করে?

– জি।

– বলো দেখি, তুমি কী শিখলে?

– আব্বু! আমার কাছে অবাক লেগেছে,

- আমাদের শুধু একটা গরু আছে, আর তাদের দুইটা গরু আছে। দুধ খাওয়ার জন্য এবং হালচাষ করার জন্য।
- আমাদের গোসল করার জন্য, সাঁতার কাটার জন্য, বাড়ির সামনের বাগানে ছোট্ট এক চিলতে সুইমিং পুল আছে। আর তাদের আছে বিরাট লম্বা এক নদী, যার কোন শেষ নেই। ওটাতে গোসল করা যায়, সাঁতার কাটা যায়, মাছ ধরা যায়, জামা-কাপড় পরিষ্কার করা যায়, গরু-ছাগলের গা ধোয়ানো যায়, জমি-জিরেতে সেচ দেওয়া যায় আবার নৌকাও চালানো যায়।
- আমরা রাতের বেলা, বাগান ও বাড়ি সাজানোর জন্য ফানুস বাতি জ্বালাই। তাও দুয়েকটা। যতক্ষণ বিদ্যুৎ থাকে জ্বলে। না থাকলে নিভে যায়। আর তাদের আছে আকাশভরা অসংখ্য-অগুনতি তারা। সারা রাত জ্বলে। কোনো বিদ্যুৎ লাগে না। দেখতেও অনেক সুন্দর।
- আমাদের বাসার সামনের উঠোনটার সীমা রাস্তার দরজা পর্যন্ত। আর তাদের উঠোনের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। দিগন্ত বিস্তৃত।

- আমাদের ঘরটা খুবই ছোট। আমাদের জীবন যাপন ওটুকু ঘরেই সীমাবদ্ধ। আর তাদের ঘরটা ছোট হলেও, তাদের গতিবিধি সেই ঘরের আঙ্গিনা পেরিয়ে, পাশের জমি ছাড়িয়ে আরো দূরে...।

- আমাদের ঘরে কয়েকজন পরিচারক আছে। তারা আমাদের সেবা করে। আর তারা নিজেরাই একে অপরের সেবা করে। কোনো চাকর-বাকরের প্রয়োজন হয় না।

- আমরা বাজার থেকে খাবার কিনে খাই। আর তারা নিজেদের জমিতে বোনা-চাষ করা খাবার খায়।

- আমাদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য আছে বাড়ির চার দেয়াল। আর তাদেরকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য আছে অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শি।

পুত্রের অভাবিত পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে পিতা বিমূঢ়। নিশ্চুপ। বাকহারা। ছেলে বলল, 'আব্বু! আমি সত্যিই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

– কেন?

– এতদিন আমি মনে করতাম, আমরা অনেক ধনী আর বড়লোক। কিন্তু তাদের দেখে আমার মনে হল, আমরাই বরং গরিব; ওরাই ধনী।

সৌন্দর্য আসলে আমাদের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। বাইরে নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা নিয়েই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, তাহলে পৃথিবী আগের চেয়ে অনেক সুন্দর আর আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

তাকদীরের লিখন

এক ধনাঢ্য ব্যক্তি খুনের দায়ে আটক হল। বিচারে ফাঁসির রায় হল। রায় কার্যকর করার জন্য, এক নির্জন দ্বীপে তাকে অন্তরীণ করে রাখা হল। সেখানেই তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

লোকটা চিন্তা করল, তার কাছে যত টাকা আছে তার বিনিময়ে হলেও প্রহরীদের হাত করবে। পালানোর ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু প্রহরী তাকে নিরাশ করে বলল, 'এই দ্বীপ থেকে কোনো জীবিত মানুষ বের হতে পারে না। পুরো জেলখানার চারপাশে চব্বিশ ঘণ্টাই কড়া পাহারা থাকে। এই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে একটা পিঁপড়াও বের হতে পারে না। এই দ্বীপ থেকে বের হওয়ার পথ একটাই, সেটা হল মৃত্যু। কেবল মৃত মানুষকেই কফিনে করে দ্বীপের বাইরে নেয়া হয়।

– তুমি যা চাও তাই পাবে। শুধু পালানোর একটা পথ বের কোরো।

মোটা অংকের ঘুষের লোভে পড়ে, প্রহরী অনেক ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের করে লোকটাকে জানাল।

– এই দ্বীপে কেউ মারা গেলে, তার কফিনটা তেমন কোন পাহারা ছাড়াই মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে দুয়েকজন প্রহরী থাকে। তারা শবটা দ্রুত দাফন করে ফিরে আসে। সকাল দশটায় কফিনবাহী নৌকা ছাড়া হয়। এখন একমাত্র সমাধান হল, মৃতের ভান করে একটা কফিনে ঢুকে পড়া। ভেতরে রাখা মৃত লোকটার সঙ্গে চুপচাপ শুয়ে থাকা। আমিই নাহয় আপনাকে কোনো একটা লাশের সাথে, কফিনে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেব।

আমিও সেদিন ছুটি নেব। সবাই দাফন করে চলে যাওয়ার আধাঘণ্টা পর আমি সমাধিক্ষেত্রে আসব। কবর খুঁড়ে আপনাকে উদ্ধার করে আনব।

লোকটা ভেবে দেখল, পালানোর ছকটা উদ্ভট আর খ্যাপাটে হলেও, অন্তত ফাঁসির চেয়ে উত্তম। সফল হলে তো কথাই নেই, ব্যর্থ হলেও হারানোর কিছু নেই।

একদিন প্রহরী এসে খবর দিল আগামীকাল একটা লাশ মেইনল্যান্ডে যাবে। সে বলল, 'আমি দরজার তালা খোলা রাখব। আপনি কফিন ঘরে গিয়ে, একেবারে বামদিকের প্রথম কফিনে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। সে কফিনে একটা লাশ রাখা থাকবে। কফিনের ডালাটা আমি ফাঁক করে রাখব। আপনি ভেতরে ঢুকে ডালাটা যতটা সম্ভব ভেতর থেকে শক্ত করে আটকে দেবেন।

পরদিন লোকটা সময়মতো কফিনে ঢুকে ঘাপটি মেরে শুয়ে পড়ল। প্রথমে ভয় ভয় করলেও, চোখ বন্ধ করে থাকল। নাকে কর্পূরের গন্ধ লাগছে। পুরো কফিনটাতে মৃত্যুর গন্ধ ছড়িয়ে আছে। কী আর করা, এছাড়া আর উপায়ও নেই। একটা লাশের সঙ্গে শুয়ে আছে, ভাবতেই গা গোলাচ্ছে। বমি বমি ভাব হচ্ছে। কেমন শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে। দাঁত-মুখ খিঁচে গুড়ি মেরে পড়ে রইল।

কিছু ক্ষণ পর লোকজনের গলার আওয়াজ শোনা গেল। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। ওরা যদি ডালা সরিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে? নাহ, তেমন কিছুই ঘটল না।

একটু বাদে সে অনুভব করল, প্রহরীরা কফিনটা কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছে। এখন হাঁটছে। কিছুক্ষণ পর মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া লাগল। বুঝতে পারল তারা এখন কারাগারের খোলা চত্বরে আছে। তারপর সমুদ্রের ডাক কানে এল। নাকে এসে লাগল নোনা বাতাসের আঁচ। তারপর পানির ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল জাহাজ এখন চলছে। একসময় জাহাজ কূলে ভিড়ল।

প্রহরীরা ধরাধরি করে কফিন ওঠালো। একজন বলে উঠল,

– বাব্বাহ! এই কফিনটা এত ভারী কেন?

আসামী লোকটা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। এই বুঝি তারা কফিনের ডালা খুলে দেখে। নাহ, তেমন কিছুই হল না দেখে তার শরীরে স্বস্তির পরশ বয়ে গেল। আরেক প্রহরী বলল, 'ভারী হবে না? যাবজ্জীবন দণ্ড পেয়ে খেয়ে খেয়ে এককেটা যা নাদুস নুদুস হয়!

সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছে তারা কফিনটাকে কবরে নামিয়ে রাখল। মাটি ফেলা হচ্ছে। বালুর কণা ফাঁক গলে কফিনের ভেতরেও এসে পড়ছে। আস্তে আস্তে আলো কমে আসছে। মাটির ওপরের আওয়াজও কমে আসছে। এক সময় আওয়াজ আর আলো দুটোই মিলিয়ে গেল। এখন শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো নেই। আওয়াজ নেই। অক্সিজেন নেই। আগের জমে থাকা কিছু অক্সিজেন ভেতরে আটকে আছে। মাটির তিন মিটার নিচে। সঙ্গে আছে একটা মরা লাশ।

প্রহরী লোকটার প্রতি তার আস্থা নেই। কিন্তু প্রহরীটার তো টাকার প্রতি লোভের শেষ নেই। লোভই তাকে টেনে নিয়ে আসবে। অক্সিজেন কমে আসতে লাগল। নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। যাতে অক্সিজেন দ্রুত শেষ না হয়ে যায়। সামনে আধঘণ্টা সময় পড়ে আছে। প্রহরীটা তো আধাঘণ্টা পর আসবে বলেছিল। এই অক্সিজেনে তাকে সময়টা পার করতে হবে।

প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। কবরের ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে লাগল। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। আবহাওয়ার স্বল্পতা দেখা দিল। নিজেকে সান্তনা দিল,

– আর মাত্র দশ মিনিট। মাত্র দশ মিনিট। এরপরই চিরমুক্তি। প্রাণভরে, বুকভরে শ্বাস। মুক্ত বাতাসে। মুক্ত আকাশে।

খকখক করে কাশি এল। দশ মিনিটও পার হয়ে গেল। অক্সিজেন প্রায় শেষ। নির্বোধটা এখনো এসে পৌঁছল না। হঠাৎ মৃদু খসখসে একটা আওয়াজ কানে এল। এতক্ষণে এল তবে। না, আওয়াজটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

হতাশায় মনটা ছেয়ে গেল। আশার আলো মিটমিট করে ফুটে উঠেই নিভে গেল। লোকটা ভয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগির মতো আচরণ শুরু করে দিল। ক্লাস্টোফোবিয়ায় ধরলো। অন্ধকারভীতি।

আচানক মনে হল, লাশটা বোধহয় একটু নড়ে উঠল। মৃতলোকটা যেন খনখন করে হাসছে। তাকে উপহাস করছে।

পকেটে এতদিন ধরে লুকিয়ে রাখা একটা দামি ঘড়ি ছিল। এতক্ষণ তো এটার কথা মনেই ছিল না। কাঁপা হাতে কায়দা করে কবজি মুচড়ে ওটা বের করে সময় দেখল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। ঘড়ির সোডিয়াম ডায়ালের সামান্য আলোতে কবরের নিকষ আঁধার যেন আবছা হয়ে এল।

কী মনে করে ঘড়িটা মৃত লোকটার মুখের কাছে নিয়ে ধরলো, কার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে আছে সেটা দেখার কৌতূহল জাগল। বিস্ফোরিত চোখে দেখল, মৃত লোকটার চেহারা হুবহু সেই প্রহরীটার মতো।

খোদাভীরু চোর

সহজ সরল আলাভোলা এক যুবক। ইলম শিখতে গেল, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক আলিমের কাছে। কয়েক বছর একটানা মেহনতের পর, যুবক এবং তার সঙ্গীরা আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করল।

একদিন উস্তাদ সবাইকে ডেকে বললেন,

– আমি যা জানি তা তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছি। এবার তোমরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাও। যা শিখেছ তা নিজেও মেনে চলবে, অন্যদেরকেও মানার জন্য দাওয়াত দেবে।

তোমরা নিজ নিজ দেশে গিয়ে কীভাবে চলবে, সে ব্যাপারে কিছু কথা তোমাদের বলছি। মনোযোগ দিয়ে শোনো।

– মানুষের ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসবে না। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে হাত পাতবে না। কারণ যে আলিম দুনিয়াদারদের কাছে হাত পাতে, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে না।

সবাই নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যাও। যার পিতা যে পেশায় ছিল, সে পেশা আঁকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা কোরো। যা-ই করো আল্লাহকে ভয় করে চলবে।

উস্তাদ এই বলে শাগরিদদেরকে অশ্রুসজল চোখে বিদায় জানালেন।

সরল যুবকও নিজভূমে ফিরে এল। মায়ের কাছে জানতে চাইল

– আম্মু! আব্বুর পেশা কী ছিল?

মা দ্বিধায় পড়ে গেলেন। কিভাবে আলিম ছেলেকে বলবেন, তোর বাবা একজন পেশাদার চোর ছিলেন। তারপর অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন,

– তোর বাবা তো আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। তার পেশার কথা জেনে তোর কী কাজ?

– আমার বাবার পেশা কী ছিল, সন্তান হিসেবে আমার জানার দরকার আছে না?

মা কথা ঘোরাতে চাইলেন; কিন্তু ছেলের পীড়াপীড়িতে বলতে বাধ্য হলেন। ছেলে বলল, 'আসার সময় উস্তাদজি আমাকে বলে দিয়েছেন, আমি যেন আব্বার পেশা গ্রহণ করি। আর পেশাগত ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলি।

মা বললেন,

– চুরি করতে গিয়ে আবার তাকওয়া কীভাবে হবে?

ছেলেটা আসলেই আলাভোলা। অতশত জটিলতা তার মাথায় খেললো না। সরল বোকা যাকে বলে আর কি। সে বলল, 'কী জানি, উস্তাদজি তো আমাদেরকে এমনটাই বলে দিয়েছেন।

এরপর তরুণ আলিম খোঁজখবর করতে লেগে গেল। চুরি কীভাবে করে, চুরি করতে কি কি লাগে ইত্যাদি। কিছুদিন লেগে থাকার পর তার চুরিবিদ্যা শেখা হয়ে গেল।

এবার অনুসন্ধানে নামল, কার বাড়িতে চুরি করা যায়। ঠিক করল প্রথমে পাশের বাড়ি থেকেই চুরি শুরু করবে। ইশার নামায পড়ল। সামান্য খাওয়া-দাওয়া করে সবার ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করল। তারপর চুরির সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকতে গিয়েই মনে পড়লো, উস্তাদজি বলেছেন, কর্মক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করতে। প্রতিবেশীর ঘরে সিঁদ কাটা তো তাকওয়া হতে পারে না। ওটা বাদ দিয়ে আরেক ঘরে গেল। সেটা ছিল এতিমদের ঘর। মনে মনে বলল, 'এতিমের সম্পদ ভক্ষণ তো হারাম।

এভাবে একটা করে ঘর বাদ দিতে দিতে এক বিরাট বড়লোক ব্যবসায়ীর প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এটাই এতক্ষণ খুঁজছিলাম। কাছে গিয়ে দেখল, দরজায় কোনো প্রহরী নেই। অনায়াসেই ভেতরে প্রবেশ করল। দেখল, নানা রকম ধন-সম্পদে পুরো ঘর ভর্তি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক টাকা-পয়সা। পুরো প্রাসাদে মানুষজনও খুব বেশি নেই। বড়জোর চার কি পাঁচজন হবে।

ঘুরতে ঘুরতে একটা কামরায় দেখল, মজবুত এক লকার। বুঝতে পারল, এখানেই সমস্ত টাকা-পয়সা রাখা আছে। গত কয়দিনের শেখা বিদ্যা ফলিয়ে লকারটা খুলতে সক্ষম হল। ভেতরটা সোনা-দানা আর হীরে জহরতে ঠাসা। সঙ্গে আনা একটা ব্যাগে সব ভর্তি করে নিতে গিয়ে মনে পড়ল, উস্তাদের নসীহতের কথা। অন্যের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া তো তাকওয়া হতে পারে না।

ভাবল, লোকটা যাকাত দিয়েছে কি-না দেখি। যাকাত না দিয়ে থাকলে, আমি হিসেব করে শুধু যাকাত পরিমাণ টাকাই নিয়ে যাবো।

লকারের ভেতরে হিসাবপত্রের খাতাও রাখা ছিল। একটা চেরাগ জ্বেলে হিসাব দেখতে লাগল। দেখল সত্যি সত্যিই যাকাত দেয়া হয়নি। যাকাতের টাকাটা আলাদা করে রাখল। এসব করতে করতে ফজরের সময় হয়ে গেল। ভেবে দেখল, তাকওয়ার দাবী হল সময় হলেই নামায আদায় করে ফেলা।

বের হয়ে উঠোনে গেল। ওযু করে জোরে আযান দিল। ঘরের মালিক আযান শুনে লাফিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। কামরা থেকে বের হয়ে দেখলেন, লকারের সামনে একটা

চেরাগ জ্বলছে। লকারের টাকা পয়সা সব এলোমেলো। আরেক লোক বাইরে আযান দিচ্ছে। ততক্ষণে স্ত্রীও চোখ ডলতে ডলতে উঠে পাশে দাঁড়ালো। স্বামীকে প্রশ্ন করল,

– কী হচ্ছে এসব?

– সেটা তো আমারও প্রশ্ন।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

– কে তুমি?

– আগে নামায, পরে কথা। ওযু করে নিন। আপনিই ইমামতি করুন। কারণ মাসআলা মতে, ঘরের মালিকেরই নামায পড়ানোর অগ্রাধিকার।

ঘরের মালিক আর স্ত্রী মুখ চাওয়াচাউয়ি করলেন। দুজনেই ভয় পেলেন, হয়তো এর কাছে কোন অস্ত্র থাকতে পারে। বিনাবাক্যব্যয়ে তাড়াতাড়ি ওযু করে নামায পড়ে নিলেন। এরপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

– তুমি কে?

– আমি একজন চোর।

– আমার খাতাপত্র নিয়ে কী করছ?

– আপনার যাকাতের হিসাব দেখছিলাম। আপনি গত ছয় বছর ধরে যাকাত দিচ্ছেন না দেখলাম। ছয় বছরের যাকাতের টাকা আমি আলাদা করে রেখেছি।

– তুমি কিভাবে জানলে?

আলিম চোর সব খুলে বলল। ব্যবসায়ী সব শুনে অবাক হল। চোরের নিখুঁত হিসাব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার সততা পছন্দ হল। যাকাতের উপকারিতা বুঝে এল।

ব্যবসায়ী লোকটি স্ত্রীর কাছে গেল। বলল, 'আমাদের যে হিসাবরক্ষক প্রয়োজন ছিল, তা বোধহয় পেয়ে গেছি। বলা যায় না, আমাদের মেয়েটারও বোধহয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

পাখির উপদেশ

শিকারীর ফাঁদে একটা পাখি ধরা পড়ল। পাখি তখন জানতে চাইল,

– আমাকে নিয়ে এখন কী করবেন?

– রান্না করে খাব।

– আমি তো মোটা-তাজা পাখি নই। রান্না করলে আমার গোশত এক লোকমাও হয়তো হবে না। তার চেয়ে বরং আপনাকে তিনটা উপদেশ দিই, সেটা আপনার জীবনে অনেক কাজে লাগবে। বিনিময়ে আমার মুক্তি।

– আচ্ছা, মানলাম। বলো দেখি, তোমার উপদেশ।

– শর্ত হল প্রথম উপদেশ আপনার হাতে থাকাবস্থায় বলব। দ্বিতীয়টা গাছের ডালে বসে বলব। আর তৃতীয় উপদেশটা আকাশে উড়ে গিয়ে বলব।

– আচ্ছা, ঠিক আছে।

পাখি শুরু করল:

প্রথম উপদেশ

'যা হাতছাড়া হয়ে যায় সেটার প্রতি মনে কোনোরকমের আফসোস রাখবেন না।'

শিকারী পাখিটা ছেড়ে দিল। পাখি গিয়ে গাছের ডালে বসল।

দ্বিতীয় উপদেশ

– অসম্ভব বস্তুতে বিশ্বাস করবেন না।

তারপর পাখিটা শিকারীকে উপহাস করে বলল, 'আপনি কতবড় বোকামি করেছেন যদি জানতেন!'

– কী বোকামি করেছি?

– আপনি আমাকে জবাই করলে, পেটের ভেতরে একশ গ্রাম স্বর্ণ পেতেন।

শিকারী আফসোস করতে লাগল। হায় কী করলাম! হায় কী ভুলটাই না করলাম।

– আচ্ছা! যা হওয়ার হয়েছে, এবার তৃতীয় উপদেশটা বল।

– তৃতীয় উপদেশ আপনার আর কী কাজে আসবে? আপনি তো প্রথম দুই উপদেশ অনুযায়ীই আমল করতে পারেননি।

– কিভাবে?

– আপনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে আফসোস করেছেন; অথচ প্রথম উপদেশ ছিল যা হাতছাড়া হয়ে গেছে, তার জন্য আফসোস করবেন না।

দ্বিতীয় উপদেশ ছিল, অসম্ভব বস্তুতে বিশ্বাস করবেন না। আপনি করেছেন। আমার পুরো শরীরের ওজনই তো একশ গ্রাম। সেখানে আবার একশ গ্রাম স্বর্ণ আসবে কোত্থেকে?!

গায়েবী ইন্তিজাম

স্বামী কয়েক দিনের জন্য বাইরে। বিশেষ প্রয়োজনে। ব্যবসায়িক কাজে। ঘরে আছেন বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী আর এক বছর বয়সী মেয়ে।

প্রচণ্ড ঝড়ো রাত। বৃষ্টির পানিতে চারদিক সয়লাব। থৈ থৈ করছে পথ-ঘাট। বিদ্যুৎ নেই। কোথাও বোধহয় খুঁটি উপড়ে গেছে। ঘরে আছে একটা মোবাইল, সেটাতেও চার্জ নেই।

একটানা শোঁ শোঁ শব্দই কানে আসছে। মানুষজন সেই সকাল থেকেই ঘরবন্দী। ছোট মেয়েটার দুপুর থেকে তীব্র জ্বর। ডাক্তার দেখানো জরুরি। অতিবৃদ্ধ শ্বশুর বারকয়েক ডাক্তারের উদ্দেশে বের হতে চেয়েছিলেন। জোর করে ধরে রাখতে হয়েছে। এমনিতে স্বাভাবিক আবহাওয়াতেও তিনি একা একা চলাফেরা করতে পারেন না, এখন এই ঘনঘটা পরিস্থিতিতে কীভাবে বের হবেন?

শাশুড়িও পর্দানশীন মহিলা। ঘর ছেড়ে বের হন না। স্ত্রীও পর্দা মেনে চলেন। মেয়েটার খইফোটা জ্বর। পাড়ার কাউকে যে ডেকে আনবেন তার জো নেই। সবাই যে যার ঘরদোরে খিল এঁটে বসে আছে।

মা কন্যার শিয়রে বসে বসে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন। শাশুড়ি সেই বিকেলে জায়নামাযে বসেছেন, আর ওঠার নাম নেই। একমাত্র নাতনির এই অবস্থা; কিন্তু করার মতো কাজ কিছুই করা যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহই একমাত্র ভরসা।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়া। শ্বশুর লাঠি ভর দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এলেন।

– কে?

– আমি অজিত, জ্যাঠামশাই। মোহনা ডিসপেনসারি থেকে এসেছি।

– এসো বাবা, এসো। নাতনিটার অবস্থা খুবই গুরুতর।

ডাক্তার ছোট মেয়েটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। ওষুধ-পথ্য দিয়ে বিদায় নিতে উদ্যত হলেন। শ্বশুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে কে খবর দিল? মারূফ খবর দিয়েছে?'

– আমি নিজেই কথাটা তুলতে চেয়েছিলাম, চাচাজি। আমাকে আসলে ফোন করা হয়েছে পাশের বাসা থেকে। তুমুল বৃষ্টির কারণে আমি ঠাহর করতে পারিনি, ভুলে এই বাসায় চলে এসেছি। টোকা দেয়ার পর আপনার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারলাম, আমি ঘর চিনতে ভুল করেছি। কিন্তু তখন তো দেখা না করে তো আর ফিরে যাওয়া যায়

না। ভগবানের কী মহিমা! ঘরে ঢুকে দেখি, আমি আসলে ভুল করিনি। ভগবান আমাকে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই এনেছেন।

ঈমান (信)

ইসলামের মাঝেই আমি খুঁজে পেয়েছি মানবতার মুক্তির আশা। তাই আমি মুসলমান হয়েছি। বলছিলেন কোরিয়ান নওমুসলিম, আবদুর রাযযাক।

আমার আগের নাম ছিল বার্ক দোং শেন। বুসান গ্রামে আমার জন্ম। দক্ষিণ কোরিয়ায়। আমার বর্তমান নিবাস সিউলে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীতে। আজ আমি বলব, আমার জীবনের সৌভাগ্যের সেতারার কথা। কিভাবে আমার জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে গেছে তার কথা। কিভাবে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছি তার কথা। কিভাবে চব্বিশ বছরের দুঃখময় ও অন্ধকারময় জীবনের অবসান হল সে কথা।

আব্বা ছিলেন একজন নেভাল ইঞ্জিনিয়ার। জাহাজে চড়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়াতেন। নানা কিসিমের মানুষের সঙ্গে ওঠবস করতেন। সে সুবাদে আমাদের বাড়িতে হরেক রকমের মানুষের আগমন ঘটত।

ছেলেবেলা থেকেই বাবার মুখে চমকপ্রদ সব গল্প শুনতাম। নানা দেশের বারোয়ারি মানুষের কথা শুনতাম। বৈচিত্রপূর্ণ জীবনযাত্রার কথা শুনতাম।

আমি ছিলাম বাবা মায়ের বেশি বয়সের সন্তান। অনেক কান্নাকাটি আর প্রার্থনার ফসল ছিলাম আমি। আমি ছিলাম আব্বুর বিশ্বাসের ফসল। তাই আমার নাম রেখেছিলেন শেন 信(ঈমান)।

তিনি আশা করেছিলেন, নামের কারণে আমিও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠব। আমরা খুব একটা ধনী ছিলাম না। সংসারে প্রাচুর্য ছিল না। কেবল এ ধর্মবিশ্বাসটাই পিতা থেকে পাওয়া একমাত্র উত্তরাধিকার।

আব্বুর চাকরি শেষে আমরা গ্রামে চলে এলাম। এই প্রথম আব্বুর সঙ্গে লম্বা সময় একসঙ্গে থাকা। আগে তো আব্বু একনাগাড়ে দীর্ঘদিন সাগরে থাকতেন। ঘরে থাকতাম আম্মু, আমি আর ছোট বোন।

আর্থিক অনটনের মাঝেই আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। তবে বেশ সুখেই। আব্বু অবসর সময়ে তার নাবিক জীবনের গল্পের ঝাঁপি খুলে বসতেন। আমরা দু ভাই-বোন কোলে বসে, চোখ বড় বড় করে শুনতাম।

আব্বু জীবনের অর্ধেক সময় সমুদ্রে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। নাবিকরা চাকুরিকালে নানারকম কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। জাহাজ বন্দরে নোঙর করলেই

নাবিক-খালাসি সবাই দলবেঁধে পাড়া-বেপাড়ায় ছুটে যায়। আব্বু কোথাও যেতেন না। শুধু বাইবেল নিয়ে পড়ে থাকতেন। তার কোনো বাড়তি রোজগারও ছিল না। তার সাথের অন্যরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেও তিনি ফিরতেন শুধুমাত্র বেতনের টাকা নিয়ে। দীর্ঘ সামুদ্রিক জীবনে তিনি কখনো বড় ধরনের দুর্ঘটনায় পড়েননি। বিপদাপদে সবাই তার কাছে প্রার্থনার জন্য আসত।

কিন্তু এখন, অবসর জীবনে এসে তার জীবনটা সুন্দর কাটছিল না। গ্রামের মানুষজন তাকে কেন যেন পছন্দ করতো না। নানাভাবে উত্যক্ত করতো। পাত্তা দিতে চাইতো না। এমনকি গির্জার পাদ্রিরাও আব্বুকে পছন্দ করতো না। তারা বোধহয় আব্বুকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতো। গির্জার পাদরিরা অবশ্য আব্বুর মতো ধার্মিক ছিলেন না। আসলে সবাই নাবিকদেরকে ভালো চোখে দেখত না। সবাই তাদেরকে পাপী মনে করত। নাস্তিক মনে করত। তাদের সেই বিশ্বাসেরই বলি হয়েছিলাম আব্বু আর আমরা।

গির্জায় প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বড়লোকদের। যারা মোটা অংকের চাঁদা দিতে পারতো, তাদের। আব্বু সবসময় গির্জার কাজে এগিয়ে থাকতেন। শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারতেন না।

সত্তরের দশকে বিশ্বঅর্থনীতির চরম মন্দা চলাকালে, কোরিয়ার অর্থনীতিও ভেঙে পড়ল। চরম অর্থসংকট দেখা দিল। এমন দুর্যোগ মুহূর্তে বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমিও সরকারি স্কুল ছেড়ে এক বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হলাম। সেটা ছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুল।

নামে স্কুল হলেও কাজের বেলায় তেমন ছিল না। স্কুলের ছেলেদের নৈতিকতা ছিল খুবই অসংলগ্ন। তাদের সঙ্গে ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। ততদিনে আমি ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছিলাম। আমার বোধোদয় হতে শুরু করেছিল, এটা কোনো জীবন হতে পারে না। ইন্দ্রিয় লিপ্সা কখনো ভালো পরিণতি বয়ে আনে না। সহপাঠীদের জীবনযাত্রা দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? আমাকে বেঁচে থাকতে হবে কেন? ঈশ্বর কোথায়?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি রাজনীতি, ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিলাম। গির্জায় যাওয়া বাড়িয়ে দিলাম। চার্চের মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

কোরিয়াতে অনেক প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ আছে। তাদের সবার কাছে গেলাম। কিন্তু এক চার্চের বক্তব্যের সঙ্গে অন্য চার্চের কোনো মিল খুঁজে পেলাম না। অথচ তারা একই বাইবেল মানে। একই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আমাকে একটা বিষয় অবাক করল।

তারা বলত ঈশ্বর একজন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা ঈশ্বরকে তিনভাগে বিভক্ত করতো। এ বিষয়ে কারো কাছেই সদুত্তর পাইনি।

খ্রিষ্টমতে, প্রতিটি শিশুই জন্মগতভাবে পাপী হয়ে জন্মায়। পাপ নিয়েই বেঁচে থাকে। মানুষ বড় হয়ে অনেক পাপ করে; কিন্তু পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে? এটা আবার কেমন কথা? যিশু কি আমাদের পাপক্ষালনের জন্যই জীবন দেননি? তাহলে আমাদের আর পাপ থাকবে কেন? আমরা কেন পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করি? আবার আমাদের পাপই যদি না থাকে তাহলে নরকের কী প্রয়োজন?

ফাদাররা বলেন, যারা গির্জায় যায় না তারা নরকে যাবে। এটা কেমন কথা? পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কুহেলিকা হয়ে ছিল। একটা ধর্ম তো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। একটা সুসংবদ্ধ নিয়মের মধ্য দিয়েই চলবে।

ফাদাররা দাবি করতেন, তাদের কাছে আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতা তারা সাধারণ অনুসারীদের মাঝে প্রয়োগ করতে পারেন। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যেও এমন ধারণা প্রচলিত ছিল।

খ্রিষ্টানরা ঈশ্বরকে 'ফাদার' বলে ডাকে। সে হিসেবে তার স্ত্রীও থাকার কথা। আর যিশু হবেন তার সন্তান। তাহলে ঈশ্বর কি একজন মানুষের মতোই? আর দশজন মানুষের মতোই তার বংশধর আছে? ঈশ্বর কি পানাহার করেন? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেন? এসব তো মনুষ্যসুলভ কাজ। মানুষের ক্ষমতার একটা সীমা আছে, ঈশ্বরেরও কি কোনো সীমা আছে? ঈশ্বরের তো সীমাহীন ক্ষমতা থাকার কথা?

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর পেলাম না। কোন শান্তি পাচ্ছিলাম না। তারা সবাই ছিল কপট। ভণ্ড। ভেকধারী। এটা শুধু কোরিয়াতেই নয়, পুরো বিশ্বের খ্রিষ্টানদেরই এ অবস্থা। সবাই নিজেদের বিশ্বাসী বলে দাবি করে, সপ্তাহে একবার চার্চে হাজির হয়, তাওবার কথা বলে; অথচ সে অবস্থাতেই তারা পাপে লিপ্ত হয়।

শীতল যুদ্ধের প্রভাবে কোরিয়া দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এই বিভক্তি জনজীবনে গভীর রেখাপাত করল। মানুষ এখন বিশ্বাস করে, সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদই মুক্তির একমাত্র উপায়। আমি পুঁজিবাদেও আশার কোনো রেখা দেখি না।

দুই কোরিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হলে, আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়াকে সার্বিক সহযোগিতা দেয়। আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে আসে খ্রিষ্টবাদ। আরও আসে পুঁজিবাদ। উপলব্ধি করলাম, যুদ্ধের ছুতো করেই আমেরিকা কোরিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

আব্বুর কাছে জানতে পারলাম, জাপান থেকে স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধে, আমাদের পরিবারের গৌরবজনক ভূমিকা আছে। পরিবারের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে আমি অন্যান্য

ইতিহাসের প্রতিও আগ্রহী হয়ে পড়ি। এসব নিয়ে পড়ালেখা করতে গিয়ে, একদিন একটা ফিল্ম দেখলাম। সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে অত্যন্ত খারাপভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখনই আমি প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারি। আমার কৌতূহল হল। লাইব্রেরিতে গিয়ে এ বিষয়ক বই খুঁজলাম, পেলাম না। সিউলে, খোঁজ করে একটা মসজিদ বের করলাম। সেখানে গিয়ে একদিন আমার চাহিদার কথা জানালাম।

এরপর আস্তে আস্তে আমার কাছে এতদিনের প্রশ্নগুলোর উত্তর পরিষ্কার হতে লাগল। আল্লাহর কাছে অসংখ্য শুকরিয়া, তিনি আমাকে তাঁর পথের দিকে টেনে এনেছেন।

অনুভূতির নির্বাসন

মানবসভ্যতা ক্রমেই যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। মানুষের মধ্যে এখন আর কোনো আবেগ কাজ করে না। আল্লাহর দেওয়া সমস্ত আবেগ-অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। তাই সবাই মিলে নিজেদের আবেগ-অনুভূতিগুলো এক দ্বীপে নির্বাসিত করে এল। বিরান এক দ্বীপে। নির্জন জন-মনুষ্যিহীন দ্বীপ। সুখ-দুঃখ, প্রজ্ঞা, ভালোবাসাসহ আরো অন্যান্য অনুভূতি এখান থেকে নির্বাসিত।

মানুষের পাপের ঢেউ এই নির্জন দ্বীপেও এসে লাগল। দ্বীপে ভূমিকম্প দেখা দিল। তীব্র কম্পনের কারণে, এতদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠল। দানবীয় শক্তিতে লাভা উদগীরণ শুরু করে দিল। এখন এই দ্বীপে তিষ্টানো দায় হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে এ দ্বীপ থেকেও সবাই পালাতে শুরু করল।

সবার সঙ্গে 'ভালোবাসা'ও পালাতে চেষ্টা করল; কিন্তু তার কাছে পালানোর মতো কোনো উপকরণ ছিল না। সে এমন কাউকে খুঁজল, যার সঙ্গে পালানো যায়। সামনে পড়লো 'সম্পদ'। সে বিরাট এক ইয়টে চেপে পালাচ্ছে। ভালোবাসা দৌড়ে কূলে দাঁড়ালো। চিৎকার করে বলল, 'ভাই সম্পদ! আমি কি আপনার ইয়টে চড়তে পারব?

– না না, আমার ইয়ট ইতোমধ্যেই স্বর্ণ-রুপা, মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরতে বোঝাই হয়ে গেছে। তিলধারণের ঠাঁইও নেই।

ভালোবাসা বিষণ্ণচিত্তে, বিরস বদনে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল, একটা ভেলায় করে 'অহংকার' যাচ্ছে।

– আমি কি আপনার ভেলায় চড়তে পারি?

– অসম্ভব! তুমি ভিজে চুপসে আছো। তুমি উঠলে আমার ভেলা ডুবে যাবে। তুমিও মরবে, আমিও মরব।

পাশ দিয়ে 'দুঃখ' যাচ্ছে। ভালোবাসা ব্যগ্রস্বরে জানতে চাইল,

– ভাই, তুমি কি আমাকে তোমার ডিঙিতে উঠিয়ে নিতে পারবে?

– না না,। আমি এমনিতেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমাকে একা থাকতে দাও।

ভালোবাসা ক্ষুণ্ণমনে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পর দেখল আনন্দে গুনগুন করতে করতে 'সুখ' যাচ্ছে। সুখকে দেখে ভালোবাসার মনে আশার সঞ্চার হল। হয়তো এবার একটা ব্যবস্থা হবে।

– ও ভাই সুখ, একটু জায়গা হবে, জায়গা?

সুখ কোনো ভ্রুক্ষেপই করল না। আপন মনে লা লা লা করতে করতে দাঁড় বেয়ে চলে গেল। সুখ চলে যেতেই সব খালি হয়ে গেল। কোথাও কেউ নেই। অল কোয়াইট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। চোখের ওপর হাত রেখে চারদিকে খুঁজল, আর কেউ আছে কি-না। দেখা গেল, দূর থেকে এক বৃদ্ধ লোক সাম্পানে করে আসছে। কাছে এসে বৃদ্ধ নিজ থেকেই বলল, 'একা একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? যে কোনো মুহূর্তে দ্বীপটা তলিয়ে যাবে। ঝটপট উঠে পড়ো।

ভালোবাসা পরম শান্তি আর নিশ্চিন্ত বোধ করল। সাম্পানে উঠে মুক্তির আনন্দে, ভুলে গেল তাকে উদ্ধার করা বৃদ্ধের পরিচয় জানতে।

ভালোবাসাকে নামিয়ে দিয়েই, বৃদ্ধ ছলাৎ ছলাৎ নৌকা বেয়ে দূরে চলে গেল। নিরাপদ কূলে নেমেই, ভালোবাসার সম্বিত হল।

– আরে! আমাকে উদ্ধারকারী বৃদ্ধের পরিচয় তো জানা হল না। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তো আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। ভালোবাসা ইতিউতি তাকিয়ে দেখল, তার পাশেই বসে আছে 'প্রজ্ঞা'। অবাক হল, এতক্ষণ তো প্রজ্ঞাকে দেখা যায়নি? বিস্ময় চেপে প্রশ্ন করল,

– প্রজ্ঞা ভাই, আপনি কি বলতে পারেন আমাকে উদ্ধারকারী বৃদ্ধটার পরিচয় কী?

– হ্যাঁ, তিনি তো 'কাল' মানে সময়।

– বলতে পারেন প্রজ্ঞা ভাই, আমাকে কেন বাঁচালেন তিনি?

– কেন, তুমি জানো না, একমাত্র কাল বা সময়ই ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেয়। ভালোবাসার অর্থ বোঝে। ভালোবাসার মূল্য বোঝে!

– কীভাবে?

– তুমি দেখবে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, বন্ধু-বন্ধুতে কত ঝগড়াঝাটি হয়। মনে হয় একে অপরকে পেলে কাঁচা চিবিয়ে খাবে। আগুনে ঝলসে খাবে। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী হয়? আস্তে আস্তে শত্রুতার তেজ কমে আসে। সময় যতই গড়ায়, বয়স যতই বাড়ে, ভালোবাসা সৃষ্টি হতে থাকে। সময়ই ভালোবাসাকে নতুন করে সৃষ্টি করে। যেখানে আপাতত ভালোবাসার কোন লক্ষণ নেই, সেখানে কিছুদিন পর ভালোবাসার কচি দূর্বা জন্ম নেয়।

স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া লাগে। মনে হয় এই বুঝি সংসার ভেঙে গেল। সোনার সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকলে, কিছুকাল গড়ালে, একসময় এই বিষাক্ত সংসারও মধুর হয়ে ওঠে। ফুলময় হয়ে ওঠে।

গোপন দান

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ﵀-এর কাছে এক অসহায় লোক এল।

– হুযুর! আমার অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে। দেনার দায়ে চাপের মুখে আছি। পাওনাদারের হাতে প্রায় জিম্মি জীবন কাটাচ্ছি! আপনি যদি কিছু একটা করতেন!

আবদুল্লাহ রহ. তাকে একটা চিঠি দিয়ে বললেন,

– এটা আমার অর্থসচিবকে দেবে। বাকি ব্যবস্থা সে করবে।

লোকটা যথাস্থানে চিঠি পৌঁছাল। সচিব জানতে চাইল,

– তুমি কতো টাকা চেয়েছ?

– সাতশ দেরহাম!

সচিব বিষয়টি যাচাই করার জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের কাছে ফের লিখে পাঠাল। উত্তর এল,

– তাকে সাত হাজার দেরহাম দিয়ে দাও!

– তাহলে আর খুব বেশি টাকা অবশিষ্ট থাকবে না।

– না থাকলে না থাকুক, হায়াতও তো ফুরিয়ে এসেছে! যা লিখেছি, লোকটাকে দিয়ে দাও! একবার লিখে ফেলার পর আর পরিবর্তন চাই না!

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ﵀ প্রায়ই 'রাক্কা' শহরে সফর করতেন। সেখানে গেলে প্রতিবার নির্দিষ্ট একটা ঘরে উঠতেন। পাশেই এক যুবক বাস করতো। তিনি রাক্কা গেলে, যুবক হযরতের দরবারে এসে, তার খেদমতে নিয়োজিত হতো। নিজ থেকেই। ঘরের কাজকর্ম স্বেচ্ছায় করে দিত। অবসরে তাঁর কাছে হাদীস পড়ত।

অন্যবারের মতো সেবারও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ﵀ রাক্কা গেলেন। কয়েক দিন হয়ে গেল, যুবকের দেখা নেই। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, যুবক দেনার দায়ে জেলে গেছে। পরিচিতজনদের প্রশ্ন করলেন,

– তার ঋণের পরিমাণ কত?

– দশ হাজার দেরহাম!

পরিমাণ জানতে পারলেন। কিন্তু কার কাছে তার দেনা—সেটা সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারল না। নিজেই ঋণদাতার খোঁজে নেমে পড়লেন। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর বের হল। রাতের আঁধারে ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করলেন। তার পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন,

– টাকাটা যে আমি শোধ করেছি—এটা কাউকে জানাতে পারবেন না। যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি। আর আগামীকাল সকালে কয়েদখানায় গিয়ে যুবককে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ﷺ সে রাতেই রাক্কা ত্যাগ করলেন। বন্দী যুবক পরদিন মুক্তি পেয়েই শুনতে পেল হযরত এসেছিলেন। আবার চলেও গেছেন গতরাতে। যুবক সংবাদটা শুনেই পড়িমরি করে ছুটল। অনেক দূর যাওয়ার পর, হযরতের দেখা পেল! যুবককে দৌড়ে আসতে দেখে তিনি থামলেন।

– আরে তুমি, কোথায় ছিলে? ঘরে দেখিনি যে?

– আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে বন্দী ছিলাম।

– আচ্ছা, তাহলে মুক্তি পেলে কিভাবে?

– আল্লাহর এক নেক বান্দা আমার হয়ে ঋণটা পরিশোধ করে দিয়েছেন। আশপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করেও তার হদিস বের করতে পারিনি!

– মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় কোরো! তিনিই নিজ অনুগ্রহে তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক আছে, এবার চলি! তুমি ঘরে ফিরে যাও। পরের বার এলে দেখা হবে। ইনশা'আল্লাহ।

আত্মহনন

শায়খ জাওয়াদ সাবরি। আমস্টারডামে এক মসজিদের খতীব। প্রথম যখন সৌদি আরব থেকে এদেশে আসেন তখন হাতেগোনা কিছু মুসলমান ছিল। এদেশে এসেই তিনি প্রথমে ডাচ ভাষা ভালোভাবে শেখেন। ডাচ ভাষাতেই ইসলাম সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য, আশপাশের মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করলেন। তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরে, ইসলামের সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরে একটা ছোট্ট বুকলেট (পুস্তিকা) তৈরি করলেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিনামূল্যে এ বই বিতরণ করেন। সঙ্গে থাকে বার বছরের সন্তান, দিয়ান মারযুক। কখনো কোলে করে নিয়ে যান তিন বছরের কন্যা নাওরাহ আফীফাকে। স্ত্রী হাদিয়া রিহমাও কখনো-সখনো থাকেন। তবে স্ত্রীর আপাদমস্তক হিজাবের সাথে, এখানকার মানুষ এখনো অভ্যস্ত নয়। তাই তাকে নিয়ে বের হতে নিরাপদ বোধ করেন না।

শায়খ জাওয়াদ তাদের বুকলেটের নাম দিয়েছেন রোড টু হেভেন। জান্নাতের পথে। বাপ-বেটার রুটিন হল, প্রতিদিন বিকেলবেলা অফিসফেরত মানুষের হাতে বইটা তুলে দেওয়া। একদিন এক সড়কে গিয়ে তাদের বিতরণকার্য চলে।

সেদিন শায়খ জাওয়াদ ব্যস্ত ছিলেন। নতুন একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। নামাযের জন্য। স্থানীয় পুলিশ থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে। সামনের জুমাটা এখানেই পড়ার খেয়াল। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। দিয়ান এসে উঁকি দিয়ে বলল, 'আব্বি! আজ যাবেন না?

– কোথায়?

– মানুষকে জান্নাতের দিকে ডাকতে?

– না বাবা, আজ মসজিদের কাজে ব্যস্ত আছি। আর বাইরে আবহাওয়াটাও খারাপ। দেখছ না ঘন তুষারপাত হচ্ছে। এ অবস্থায় বাইরে বের হওয়াটা ঝুঁকির।

– কিন্তু আব্বু, আপনি তো বলেছেন, একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ না করে জাহান্নামে যাওয়াটা সবচেয়ে খারাপ। এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। তাহলে আজ আমি একা একা যাই?

– যাও, তবে বেশিদূর যেয়ো না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

দিয়ান বের হল। বেরিয়ে দেখল, আসলেই তুমুল তুষারপাত হচ্ছে। চারদিক আঁধার করে। পেঁজাতুলার মতো। বাইরে চারদিকটা তুষার-শীতল আর ধবল হয়ে আছে।

দিয়ান এপথ-ওপথ ঘুরে পুস্তিকাটা বিতরণ করল। শেষে বাকি থাকল একটা পুস্তিকা। রাস্তাঘাটে আর কোনো জনমনুষ্যি নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কারো দেখা পেল না।

শেষে, পাশের এক বাড়িতে গিয়ে কলিং বেল টিপল। ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আরো একবার বাজাল। উঁহু! এবারও কোনো সাড়া মিলল না। তৃতীয়বার বাজিয়ে দেখল। ফলোদয় হল না।

দিয়ানের মনে হল, ভেতরে কেউ না কেউ আছে। ইচ্ছা করেই দরজা খুলছে না। সিদ্ধান্ত নিল, অপেক্ষা করবে। শেষটা দেখেই যাবে। আচানক দরজাটা খুলে গেল। দিয়ান অবাক হয়ে দেখল, এক বৃদ্ধা দরজা দিয়ে মুখ বের করে বাইরে উঁকি দিলেন। বৃদ্ধাও দরজায় দাঁড়ানো কিশোরকে দেখে ভীষণ অবাক হলেন। এমন দুর্যোগময় আবহাওয়ায় এই ছেলে বাইরে কেন?

– তোমার জন্য কী করতে পারি বাছা?

– মাদার! আমি খুবই দুঃখিত। আপনাকে এই সময়ে বিরক্ত করলাম। আমি আপনাকে শুধু একটা কথা বলতে এসেছি।

– কী বাছা?

– আপনাকে একটা বুকলেট দিতে এসেছি। আর একটা কথা, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। তিনি আপনাকে সবসময়ই দেখছেন। আপনার খোঁজ-খবর রাখছেন। এই ছোট্ট বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এ বই পড়লে আপনি আল্লাহকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ কেন আপনাকে সৃষ্টি করেছেন জানতে পারবেন। কিভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হয় তাও জানতে পারবেন।

– ধন্যবাদ, বাছা!

ঘটনার চারদিন পর।

মসজিদে জুমুআর নামাযের প্রস্তুতি চলছে। একজন বৃদ্ধা মহিলা লাঠি ভর দিয়ে মসজিদ চত্বরে এলেন। বললেন,

– আমাকে আপনারা কেউ চিনবেন না। আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। গত কয়েকদিন আগে। প্রচণ্ড তুষারপাতের দিন। ঘরে একা ছিলাম। আমার স্বামী কয়েক মাস আগে মারা গিয়েছেন। একটা ছেলে থেকেও নেই। এই আবহাওয়া আমার ভেতরে চরম হতাশার জন্ম দিল। এমনিতেই জেমস, মানে আমার স্বামী মারা যাওয়ার পথ থেকেই জীবনের স্বাদ চলে গিয়েছিল। সেদিন ঠিক করলাম, এই জীবন আর রাখব না। আগেই

একটা দড়ি যোগাড় করে রেখেছিলাম। গলায় ফাঁস লাগিয়ে চেয়ারের ওপর দাঁড়ালাম। লাফ দিতে যাব, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। আমি তেমন গা করলাম না। আমার ঘরে আসার মতো কেউ নেই। অপরিচিত কেউ হবে, এমনটা ভেবে গুরুত্ব দিলাম না। বেল বাজিয়ে বিরক্ত হয়ে, একসময় নিজ থেকেই চলে যাবে।

কিন্তু না, আমার চিন্তা ভুল প্রমাণ করে, অজানা আগন্তুক একটানা ডোরবেল বাজিয়েই চলল। গলা থেকে ফাঁসটা খুলে চেয়ার থেকে নামলাম। দরজা খুললাম। দেখলাম, ওই যে সামনে বসে আছে, সেই ছেলেটা, দরজায় দাঁড়িয়ে হি হি করে কাঁপছে। আমার মন তখন দয়ায় ভরে গেল। এশিয়ান চেহারা দেখে ভেবেছিলাম, কোনো সাহায্য চাইতে এসেছে। আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত করে, সে আমাকে আশার কথা শোনাল। একটা পুস্তিকা দিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলল। চলে আসার সময় বলে এলো– বইটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখবেন। কোন প্রশ্ন থাকলে নিচে দেয়া ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছি। নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমি আল্লাহর পরিচয় জানতে পেরেছি। সবই এই ছোট্ট ছেলেটার অবদান। এখন বলুন, আমাকে কী করতে হবে। কিভাবে আমি একজন ভালো মুসলিম হতে পারব।

বৃদ্ধার কথা শুনে, শায়খ জাওয়াদ সাবরি-সহ মসজিদের সবার চোখেই আবেগের অশ্রু চিকচিক করতে লাগল। বাবা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। পরম মমতায় কপালে চুম্বন এঁকে দিলেন।

নিষিদ্ধ অলংকার

রাজ্যে অর্থসংকট দেখা দিয়েছে। বিপুল ঋণ পরিশোধ করতে করতে রাজা পর্যুদস্ত। কোমর ভেঙ্গে গেছে। যেখানে যা পেয়েছেন টেনে নিয়েছেন। এবার রাজার চোখ পড়েছে রাজ্যের স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি। রাজা ফরমান জারি করলেন,

আজ থেকে এ রাজ্যে কোনো নারী কোনো ধরনের অলংকার পরতে পারবে না।

ফরমান শুনে রাজ্যজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পুরুষরা দলে দলে স্বাগত জানাল। মহিলারা ফুঁসে উঠল। তীব্র প্রতিবাদ জানাল। স্ত্রীদের রোষের মুখে স্বামীরাও উপরে উপরে মত পাল্টাতে বাধ্য হল।

আস্তে আস্তে বিষয়টা গণবিস্ফোরণে রূপ নেয়ার আশংকা দেখা দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে, রাজা জরুরি পরামর্শ ডাকলেন। একদল বলল, 'এই ফরমান উঠিয়ে নিন।

আরেকদল বলল, 'না, এই ফরমান উঠিয়ে নেয়া যাবে না। তাহলে রাজার দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

রাজা পড়লেন উভয়সংকটে। এরপর রাজ্যের বৃদ্ধ জ্ঞানীলোককে রাজতলব করা হল। তিনি পালকিতে চড়ে প্রাসাদে এলেন।

– প-তিজি, আমরা তো এক মহাসংকটে পড়েছি। এখন কী করতে পারি? ফরমানটা কি বাতিল করে দেব? নাকি বহাল রাখব? আমাদের কী করা উচিত?

– আপনাকে এখন প্রজাদের অনুভূতি কৌশলে কাজে লাগাতে হবে। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার অবস্থান থেকে চিন্তা করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার সমাধান করতে হলে আপনাকে প্রজাদের অবস্থান থেকে চিন্তা করতে হবে।

– সেটা কীভাবে?

– আপনি আগের ফরমানটাই হুবহু আবার জারি করবেন। তবে শেষে একটা কিন্তু যোগ করে দেবেন,

আজ থেকে এই রাজ্যে কোনো নারী, কোনো ধরনের অলংকার পরতে পারবে না। কারণ সুন্দরীদের অলংকারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু, কুৎসিত-কদাকার ও বুড়িরা এই আইনের আওতামুক্ত। তারা অলংকার যত ইচ্ছা পরতে পারবে।

কে-ই-বা নিজেকে কুৎসিত আর বুড়ি ভাবতে চায়?

হারানো হার

মক্কায় এক যুবক বাস করত। পরহেজগার, খোদাভীরু; তবে খুবই গরিব। একদিন ওই যুবক জীবিকার উদ্দেশ্যে, মক্কার গলি দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা হার পড়ে আছে। আশপাশে আর কেউ নেই দেখে হারটা উঠিয়ে নিল। মালিকের খোঁজে হারাম শরীফে এল। এমন সময় একটা ঘোষণা কানে এল,

– আমি একটা হার হারিয়েছি। কোন দয়ালু ভাই পেয়ে থাকলে, আল্লাহর ওয়াস্তে ফিরিয়ে দেবেন।

যুবকটা এগিয়ে গিয়ে বললেন,

– আপনার হারটা কেমন, বর্ণনা দিন তো?

বর্ণনা মিলে গেলে, হারটা হস্তান্তর করলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, লোকটা হারখানা নিয়ে টু শব্দও করল না। সোজা গটগট করে হেঁটে চলে গেল। সামান্য ধন্যবাদ বা শুকরিয়াও জানাল না।

আমি আল্লাহর কাছে বললাম,

– ইয়া আল্লাহ! আমি যদি এই সামান্য কাজটুকু আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করে থাকি, আপনি আমার জন্য এর চেয়েও ভালো প্রতিদান জমা করে রাখুন। আমীন।

এরপর আমি রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়ে বসলাম। তাকদীরের লিখন এমনই যে, জাহাজ পড়ল ঝড়ের কবলে। পুরো জাহাজ ভেঙে চুরমার হয় গেল। যাত্রীরা অধিকাংশই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করল। যে হাতের কাছে যা পেল ওটা ধরেই ভেসে রইল। আমিও ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠলাম। ওখানে একটা মসজিদ দেখতে পেয়ে আমার মন বেশ প্রফুল্ল হল। মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলাম। আমার তো যাওয়ার আপাতত কোনো জায়গা নেই। ভবঘুরে। তাই মসজিদেই আপাতত সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

মসজিদে এক জিলদ কুরআন শরীফ পেলাম। বসে বসে ওটাই তিলাওয়াত শুরু করলাম। নামাযের সময়, আমাকে কুরআন পড়তে দেখে সবাই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। আমার কুশলাদি জানতে চাইল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,

– আপনি কুরআন পড়তে পারেন?

– জি, পারি।

তারা বলল, 'আমাদের কাছে কুরআন কারীমের এই জিলদ অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। আমরা এটা পড়তে পারি না। তাই পরম যত্নে রেখে দিয়েছি। এক নাবিকের কাছ থেকেই আমরা এটা কিনেছিলাম। আমাদের এই দ্বীপে আগে একজন ছিলেন, তিনি কুরআন পড়তে পারতেন। সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম, তিনিই সবাইকে কুরআন শিক্ষা দিবেন। একবার তিনি হজে গেলেন। তারপর আর ফিরে আসেননি। এখন আপনি আমাদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিন।

আমি দ্বীপের বাচ্চাদেরকে কুরআন কারীম শিক্ষা দিতে লাগলাম। অন্য লেখাপড়াও শেখাতে থাকলাম।

কিছুদিন পর এলাকার মুরুব্বিরা বললেন,

– আমাদের এলাকায় এক এতিম মেয়ে আছে। সর্বগুণে গুণান্বিতা। আপনি কি তাকে বিয়ে করতে রাজি হবেন?

– আমার কোনো আপত্তি নেই।

আমাদের বিয়ে হল। বাসর রাতে স্ত্রীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তাকে দেখে তো আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। দেখলাম, তার গলায় মক্কায় আমার কুড়িয়ে পাওয়া সেই হার ঝুলছে। জানতে চাইলাম,

– এই হার তোমার কাছে কীভাবে এল?

নববধূ লাজুক মুখে উত্তর দিল,

– আব্বু সেবার হজে গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হারটা হারিয়ে গেল। কিন্তু এক মহৎ ব্যক্তির বদান্যতায় হারটা ফিরে পেলেন। আব্বু সবসময় দুআ করতেন,

– ইয়া আল্লাহ! আমার মেয়ের জন্য, মক্কার ওই মহৎ ব্যক্তির মতো একজন স্বামী মিলিয়ে দিন।

কন্যাসন্তান

একজন স্কুল-শিক্ষিকা। রূপে-গুণে সবদিক থেকে অতুলনীয়। বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু বিয়ের নামগন্ধও তার মুখে নেই। সবাই অনেক বলে-কয়েও কিছু করতে পারেনি। হাজার সাধাসাধিতেও তার বরফ গলাতে পারেনি। সবাই বুঝতে পারে, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

একদিন সহকর্মীরা সবাই ধরে বসল, আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। বলতেই হবে, কেন তুমি বিয়ে করছ না। তুমি তো কোনো দিক দিয়েই ফেলনা নও। বিয়ে করে স্বামী-সংসার যারা করছে, তাদের চেয়ে তুমি কম কিসে? তাদের অনেকে তো এমনও আছে, যারা তোমার নখের যুগ্যিও নয়।

– তোমরা এত করে যখন বলছ, তাহলে একটা গল্প বলছি শোনো। একজন মহিলার ঘরে পাঁচটা কন্যাসন্তান জন্ম নিল। স্বামী তিতিবিরক্ত। পঞ্চম কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হুমকি দিয়ে রেখেছে,

– এবারও যদি কন্যা হয়, গলা টিপে না হয় অন্যভাবে হলেও নবজাতককে মেরে ফেলব।

আল্লাহর ইচ্ছা, এবারও কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। বাবা সদ্যজাত কন্যাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে, রাতের গভীরে চৌরাস্তার মোড়ে রেখে এলো। ফজরের পরে দেখতে পেল, মেয়ে শান্তভাবে বিছানায় ঘুমুচ্ছে। পরদিন আবার রেখে এল। আজও একই কাণ্ড হল। পরপর এক সপ্তাহ এভাবে করে চলল। অবস্থার কোনো হেরফের হল না।

দুঃখিনী মা, এই সাতটা রাত কুরআন তিলাওয়াত করেই বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিলেন। আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে রইলেন। দয়ালু রব মায়ের কথা ফেলে দেননি। তিনি কখনো ফেলে দেনও না। আমরা বান্দারাই যা ভুল বুঝি। সাতদিনেও মেয়েটার কিছু না হওয়াতে, শেষ পর্যন্ত বাবা পাশবিক কার্যক্রমের ইতি টানলেন।

কিছুদিন পর মা আবার গর্ভবতী হলেন। মায়ের মনে ভয়, এবার কন্যা হলে বুঝি তার নিজেরও নিস্তার নেই। পুরো দশটা মাস ভয়ে ভয়ে কাটল। তিনি ধরেই নিলেন, তার আবার কন্যা হবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার জানে পানি এল। যাক, এতদিনে আল্লাহ তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। বাবার খুশি আর ধরে না। কিন্তু মায়ের হিসেবে গরমিল

হয়ে গেল। ছেলেটা হওয়ার পরদিনই বড় মেয়েটা মারা গেল। দুবছর না ঘুরতেই আল্লাহ আরেকটা ছেলে দিলেন। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, পরদিন আরেকটা মেয়ে মারা গেল।

এভাবে, আল্লাহ একে একে পাঁচটা পুত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা কন্যাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিলেন। মা এই শোক সামলাতে পারলেন না। পঞ্চম মেয়ে মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে, মা-ও না ফেরার দেশে চলে গেলেন। একমাত্র বেঁচে থাকা মেয়েটাই নবজাতক ভাইকে কোলেপিঠে করে মানুষ করে তুলল। অন্য ভাইদের আদর-আবদার মেটালো।

প্রিয় সহকর্মীরা! তোমরা কি বুঝতে পারছ, সেই মেয়েটা কে? যাকে বাবা আঁতুর ঘরেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল?

সে মেয়েটা হলেম আমি। বিয়ে করিনি। কারণ, আমার গুণধর পাঁচ ভাই, বিয়ে করে যে যার সংসার নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। পিতার কোনো খোঁজ-খবরও নেয় না। মাসে ছ-মাসে ইচ্ছে হলে এক-আধপাক এসে ঘুরে যায়। কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার চলে যায়।

বৃদ্ধ পিতা ঘরে একা। অচল। তাকে একা রেখে অন্য কিছু ভাবা তো সম্ভব নয়। আব্বু সারাক্ষণ চোখের পানি ফেলেন আর অনুশোচনা করেন। বারবার তার কৃতকর্মের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চান।

মনের জেলখানা

জমিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। প্রতিদিন এ সময়টাতেই লোকটা ঘর থেকে জমির উদ্দেশে বের হয়। স্ত্রী পুকুরপাড়ের কোণ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। কৃষক হাতে কোদাল নিয়ে চলে গেল।

লোকটা সুয্যি ডোবার আগেই প্রতিদিন বাড়ি ফিরে আসে। আজ ফিরল না। রাত হল, ফিরল না। বউ পাশের বাড়িতে গিয়ে বলল। আশপাশের পুরুষরা খুঁজতে বের হল। না, কোথাও কোনো খোঁজ মিলল না।

দিন গেল। হপ্তা গেল। মাস গড়িয়ে বছর ঘুরল। এখনো মানুষটার দেখা নেই। এভাবে কেউ হাওয়া হয়ে যায়? মানুষটা জীবিত না মৃত, তাও বলা যাচ্ছে না।

ঘটনার অনেক বছর পর, এক গভীর রাতে, দরজায় টোকা পড়ল। আলতো করে। মৃদু শব্দ। শোনা যায় কি যায় না। প্রতীক্ষার প্রহর গোনা স্ত্রীর মনে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। এ-তো সেই পরিচিত আওয়াজ। চেনা টোকার ভঙ্গি। হারানো সুর।

দরজা খুলল। দেখল, দরজায় দাড়ি-গোঁফে মুখভর্তি এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সেদিনের সেই কোদাল। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, হারানো স্বামীর চোখদুটো তার দিকে, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। স্বামী ঘরে প্রবেশ করে ধপাস করে বসে পড়ল। স্ত্রী কোমল স্বরে জানতে চাইল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

– সে এক লম্বা কাহিনী। সেদিন আমি জমির উদ্দেশে ঘর থেকে বের হলাম। যেমনটা প্রতিদিন করি। আমাদের জমিতে নামার সময় দেখি, এক ব্যক্তি জমির আইলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন খুঁজছে। ভাবসাব দেখে মনে হল, কারো অপেক্ষা করছে। কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, আপনি কাউকে বা কিছু খুঁজছেন?

লোকটা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী যেন বলল। আমি ঠাহর করতে পারলাম না।

– কী বলেছেন, বুঝতে পারিনি। আবার বলুন।

লোকটা খলখল করে হাসতে শুরু করল। তার দুচোখে অশুভ কিছু একটার ছায়া খেলা করতে দেখলাম। বিদঘুটে হাসি থামিয়ে বলল, 'আমি তোর কানে কালো জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়েছি। এই মন্ত্র তোর মনের গভীরে গিয়ে বসেছে। এই মন্ত্রবলে, আজ থেকে তুই আমার দাস। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তুই এভাবেই থাকবি।

এর নড়চড় হলে একদল দুষ্ট জিন তোকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। তোর আত্মাকে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে বন্দী করে রাখবে। সেখানে তোর আত্মাকে অনবরত কঠিন যন্ত্রণা আর নির্যাতনের মধ্যে রাখা হবে। একদণ্ডও স্বস্তিতে থাকতে দেয়া হবে না। যতদিন পর্যন্ত জিনের বাদশা সিংহাসনে সমাসীন থাকবেন ততদিন তোর আত্মার কোনো মুক্তি নেই।

এরপর লোকটা আমাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক গহীন বনে নিয়ে গেল। আমি লোকটার সেবায় নিয়োজিত হলাম। দিনে তার সব কাজ করে দিতাম। রাত হলে জেগে জেগে পাহারা দিতাম।

সেই বন পার হয়ে এক বিরাট দুর্গে পৌঁছলাম। আমরা প্রবেশ করার পর দুর্গের ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল। ফটকের চাবি একমাত্র সেই লোকটার কাছেই থাকত।

দুর্গটাকে একটা কবর বললেই বোধহয় ঠিক হবে। দুর্গের ভেতরে গিয়ে দেখলাম, আমার মতোই আরো অনেক লোক সেখানে বেগার খাটছে। প্রত্যেকের গলাতে একটা করে মালা ঝোলানো। তাতে একটা চাবি ঝুলছে। আমাকেও একটা মালা পরিয়ে দেয়া হল। রাত নামলে সবাই যে যার কুঠুরিতে ঢুকে নিজে নিজেই তালা বন্ধ করে দিল। চাবি সেই গলায় ঝোলানোটাই। সবার দেখাদেখি আমিও তাই করলাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে প্রতি রাতেই, গলার চাবিটা নেড়েচেড়ে দেখতাম। তোমার কথা ভেবে ভেবে কাতরভাবে চোখের পানি ফেলতাম। ভাবতাম, তোমার মাঝে আর আমার মাঝে এই একটা তালাই বাধা হয়ে আছে। তালার চাবিটাও আমার গলার সঙ্গে ঝোলানো; অথচ বের হতে পারছি না।

জাদুকর লোকটা ছিল অত্যন্ত নির্দয়। চরম নিষ্ঠুর। দয়া-মায়ার লেশমাত্র তার মনে ছিল না। করুণা কাকে বলে লোকটা জানত না। মানুষ এতটা নির্মম হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমাদেরকে নিত্য-নতুন পন্থায় নির্যাতন করত। এ নিয়ে তার মধ্যে কোনোধরনের বিকার বা জড়তা ছিল না।

সাথীদের দেখতাম, জাদুকর লোকটার অকথ্য নির্যাতন সইতে না পেরে শিশুর মতো কাঁদতো। আমাদের অনেকে লোকটার পায়ের ওপর পড়ে বলতো,

– দয়া করে, আমার ওপর প্রয়োগ করা মন্ত্রপূত বান-টোনাটা কেটে দিন। তখন লোকটা কসম কেটে বলত,

– এই বান কাটার কোনো উপায় আমার জানা নেই। এই জাদুচক্র থেকে কোনো নিস্তার নেই। এমনকি মরার পরও না। একমাত্র আমার সেবা করে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, বাঁচার ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে।

লোকটা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন রোগবালাই দেখা দিয়েছিল। নানান রোগে ভুগে আস্তে আস্তে তার শরীরটা নিস্তেজ হয়ে আসছিল। কিছুদিনের মধ্যে লোকটা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল। আমি তাকে বললাম,

– মনিব! আপনি তো মারা যাবেন; কিন্তু আমাদের জন্য তো কোনো বিহিত করে গেলেন না। যে দুষ্ট জাদুচক্রে আমাদের ফেলেছেন, তার থেকে মুক্তির তো কোনো ব্যবস্থা করে গেলেন না। আমাদের কী উপায় হবে?

আমার কথা শুনে জাদুকর খনখনে গলায় হেসে উঠল। তার হাসি শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যেদিন তাকে প্রথমবার দেখেছিলাম সেদিনও এভাবে গা ছমছমে শীতল হাসি দিয়েছিল। বলল, 'রে বেকুব, আমি জাদু-টোনা, তুকতাক কিছুই জানি না। তোদের কানে যে মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়েছিলাম, সেটা ছিল একটা ভাওতাবাজি-ধাপ্পা। তোদের দুর্বল মনই তোদেরকে আমার দাসে পরিণত করেছে। অলীক-অমূলক ধ্বংসের ভয় তোদেরকে জেলখানায় বন্দী করে রেখেছে।

আমি তোদের গলায় যে চাবি ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম, সে চাবির মতই একটা বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ তোদের দান করেছিলেন; কিন্তু তোরা সেটাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাসনি।

তোরা যদি তোদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাময় জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট না হতিস তাহলে অনায়াসেই দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে পারতি। প্রতি রাতেই আমি তোদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম। ভীষণ অবাক হয়ে ভাবতাম, ইস কী বোকা তোরা! তোদের চিন্তাশক্তি কতটা পঙ্গু!

জাদুকর লোকটার কথা শুনে আমি কানে হাত চেপে দৌড়ে কুঠুরিতে এলাম। কুঠারখানা নিয়েই ছুট দিলাম। লোকটাকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব। ফিরে এসে দেখি তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

সবাইকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। ওরা অন্ধ আর ব্যর্থ আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। জাদুকরের মৃতদেহটাকে সবাই টুকরো টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল। আমি ফিরে আসতে আসতে আকূল হয়ে ভেবেছি, তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছো, না অন্যের ঘরণী হয়ে গেছ। আমাকে মনে রেখেছো, নাকি ভুলে গেছ।

স্ত্রী বলল, 'প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী আমার! আমার আত্মা হরবক্ত আপনার সঙ্গেই ছিল। রাতের বেলা আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, আপনিও এই চাঁদটা দেখছেন। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, আপনি কোথাও আটকা পড়ে আছেন।

আমাদের দুনিয়ার জীবনটাও এমনি। এটাকে আমরা নিজ হাতে জেলখানা বানিয়ে রেখেছি। এই জেলখানা থেকে বের হওয়ার চাবি হল ঈমান। আমরা চাইলেই এই জেলখানা

থেকে বের হতে পারি। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসতে পারি। শান্তি ও সৌভাগ্যের দিকে আসতে পারি।

বলতে গেলে আমরা সবাই, কোনো না কোনো জেলখানায় বন্দী হয়ে আছি। কেউ আছি ভয়ের জেলখানায়। কেউ আছি দুঃখের জেলখানায়। কেউ বন্দী হয়ে আছি লোভ-লালসার জেলখানায়। কেউ বন্দী হয়ে আছি নৈরাশ্য আর হতাশার জেলখানায়। কেউ বন্দী হয়ে আছি ভুলবিশ্বাস আর কুসংস্কারের জেলখানায়। এই জেলখানা থেকে মুক্তির চাবি কিন্তু আমাদের হাতেই দেয়া আছে।

ইস্তিগফারের বরকত

এক লোক মসজিদে প্রবেশ করল। মন খারাপ। একপাশে গিয়ে বসে রইল। একজন বৃদ্ধ হুযুর আরেক পাশে ছিলেন। বৃদ্ধ হুযুর কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন,

– বাছা, এখন তো নামাযের সময় নয়। তুমি মসজিদে এলে যে?

– হুযুর, আমি বিয়ে করেছি বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। এখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমাদের ঘরে নতুন কোনো মেহমান আসেনি। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ পেরেশান। সংসারে সন্তান না থাকায় ওকে নানাজন নানা কথা বলে। আল্লাহ আমাদেরকে সন্তান না দেয়ার ফায়সালা করলে, সেটাতে আমি রাজি। আমার স্ত্রীকেও বারবার সান্ত্বনা দিয়ে আসছি। আর সন্তান না হওয়া তো তার দোষ নয়। আমরা দুজনেই বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত; কিন্তু মানুষের কটাক্ষ আর বিদ্রƒপের কারণে অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমার স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে, সে কিছুদিন পর পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবে। রুবাবা মানে আমার স্ত্রী, সে এতো ভালো একটা মেয়ে যে, তাকে ছাড়া আমার জীবনটাও পানসে হয়ে যাবে। জীবনের কোন স্বাদ আমি পাব না।

কোন ডাক্তার-বৈদ্য-কবিরাজ আমি বাদ রাখিনি। কিছুতেই কিছু হল না। বৃদ্ধ হুযুর বললেন,

– তুমি স্থির হয়ে বসো। আমি তোমাকে একটা ওষুধ দেব। ওষুধটার ব্যবহারবিধি খুবই কঠিন। তবে আমি আল্লাহর ওপর পুরোপুরি তাওয়াক্কুল করেই বলছি, এ ওষুধে তোমার অবশ্যই সন্তান হবে। ইনশা আল্লাহ।

– আল্লাহর দোহাই লাগে হুযুর, আপনি যত কঠিন আর কষ্টকর ওষুধই দেন, আমি সেটা ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত। ইনশা আল্লাহ!

– তোমরা দুজনেই, ফজরের আযানের কমপক্ষে একঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠবে। সময়টাকে দু-ভাগে ভাগ করে নেবে। প্রথম ভাগে কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়বে। দ্বিতীয় ভাগে ইস্তিগফার পড়বে। এভাবে নিয়মিত আমল করে যাবে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন,

> « আর আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করো, নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। (এর ফলে) তিনি তোমাদের ওপর প্রবল বর্ষণ করবেন,

আর তিনি তোমাদেরকে সম্পদ, সন্তান দ্বারা সাহায্য করবেন। আর তোমাদের জন্য বানিয়ে রাখবেন বাগ-বাগিচা। আর তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদীনালা। [সূরা নূহ, ৭১:৯–১১]

লোকটা ঘরে ফিরে গেল। স্ত্রীকে বলল, 'ওগো! আলহামদু লিল্লাহ, অবশেষে আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

– কীভাবে?

স্বামী বিষয়টা খুলে বলল। জিজ্ঞাসা করল,

– তুমি কি এই আমল করতে প্রস্তুত?

– জি, আমি অবশ্যই প্রস্তুত। আপনার সঙ্গে কোনো কথায় কি আমি অমত করি? আমরা কোন দিন থেকে আমলটা শুরু করব?

– কেন আজ থেকেই, কোন অসুবিধা আছে তোমার?

– জি না।

তারা দুজনেই আমলটা শুরু করল। পনের দিন যেতে না যেতেই স্ত্রীর মধ্যে গর্ভধারণের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পেতে শুরু করল। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর তিনিও বিস্মিত হয়ে বললেন,

– আপনাদের জন্য তো সুখবর আছে।

এটা ছিল ইস্তিগফারের বরকত। কুরআনের আয়াতটাতে তো আল্লাহ এমনটাই ইঙ্গিত করেছেন।

শিকার-মন্ত্রী

রাজা মশায়ের বেজায় শিকারের সখ। শিকারের নেশা রাজাকে সারাক্ষণ বিভোর করে রাখে। শুধু শিকার করা বা শিকারে যাওয়াই নয়, শিকারের গল্প পেলেও রাজার হুঁশ থাকে না। ওটাতেই মজে থাকেন।

এজন্য রাজা একজন শিকার-মন্ত্রীও নিয়োগ দিয়েছেন। শিকার মন্ত্রীর কাজ হল, কোথায় কখন বের হলে ভালো শিকার পাওয়া যাবে তার খোঁজ-খবর রাখা। বিশেষ করে আবহাওয়ার খোঁজ-খবর রাখাও মন্ত্রীর দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। শিকারে যাওয়ার সময় যাতে বৃষ্টি-বাদলা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

একদিন রাজার বাই চাপল, শিকারে বের হবেন। রাজার সঙ্গে যাবে রাজকুমার, রাজকুমারী ও বড় রানি। উজির-নাজির, অমাত্যবর্গ সমব্যভিহারে। সবাই নিজ চোখে দেখুক রাজার শিকারনৈপুণ্য। শিকার-মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন আবহাওয়া যাচাই করতে। কোন দিন গেলে উপযোগী আবহাওয়া পাওয়া যাবে। বৃষ্টি-বাদলা হবে না।

শিকার-মন্ত্রী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন অমুক দিন বের হলে ভালো হয়। সেদিন চনমনে রোদ উঠবে। শিকারও পাওয়া যাবে ভালো। হরিণগুলো রোদ পোহাতে বনের ধারে ঝিলের পাড়ে আসবে।

রাজা মহাসমারোহে রওয়ানা দিলেন। বিরাট শোভাযাত্রা রাজধানী ছেড়ে বনের পথে চলল। চলতে চলতে গভীর বনে পৌঁছল। ওখানে সবার থাকার ব্যবস্থা করতে না করতেই বন-জঙ্গল দাপিয়ে ঝড়-তুফান শুরু হল। তীব্র বাতাসে তাঁবু ছিঁড়েখুঁড়ে উড়ে গেল। জিনিসপত্র জলে-কাদায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। বড় বড় মন্ত্রীরা কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। রাজা তো রেগে কাঁই। পারলে শিকার-মন্ত্রীকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন এমন অবস্থা।

শিকার অভিযান ব্যর্থ হল। সবাই ভগ্নহৃদয়ে বিফল মনোরথে ফিরে চলল। বনের শেষপ্রান্তে এসে দেখা গেল একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর। সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কুঁড়েঘরের সামনে অনেকগুলো চেরাকাঠ আর লাকড়ি পড়ে আছে। ঘরের দরজা বন্ধ। রাজা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। পায়ে পায়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে দিল কুড়াল হাতে এক কাঠুরিয়া। রাজা জানতে চাইলেন,

– কাজে না গিয়ে ঘরে বসে আছো কেন?

– আমি জানতাম আজ ঝড়-তুফান হবে, তাই কাজে যাইনি।

রাজা অবাক হলেন।

– তুমি কিভাবে জানলে?

– আমার গাধার কাছে জানতে পেরেছি।

– গাধার কাছে? সেটা কিভাবে।

– প্রতিদিন সকাল বেলা আমার গাধার দিকে তাকাই। তার দুকান খাড়া থাকলে, বুঝতে পারি আজ আবহাওয়া খারাপ হবে। আর কান নামানো থাকলে বুঝতে পারি আবহাওয়া ভালো যাবে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে শিকার-মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন। এরপর রাজা শাহী ফরমান জারি করে ঘোষণা করলেন,

আজ হইতে কাঠুরিয়ার গাধাটাই হইবে এই রাজ্যের শিকার-মন্ত্রী।

সেদিন থেকেই, গাধারাই দেশের বড় বড় পদগুলো অলংকৃত করে আসছে।

শয়তান ও বুড়ি

এক বুড়ি ছিল খুবই হিংসুটে। কিভাবে অন্যের ক্ষতি করা যায় এ চিন্তায় সারাক্ষণই বিভোর। অন্যের বিন্দুমাত্র ভালো সে সহ্য করতে পারত না। তার হিংসার বিষে আশপাশের সবাই অতিষ্ঠ। এর কথা ওর কাছে বলছে, ওর কথা এর কাছে বলছে। বানিয়ে বানিয়ে একজনের কাছে অন্যের নিন্দা করছে।

এসব দেখে শয়তান মুগ্ধ হয়ে বুড়ির কাছে এল।

– তুমি তো পুরষ্কারযোগ্য কাজ দেখালে।

– তুই কে?

– আমি শয়তান।

– ও তুই, তা আমার কাছে কেন এসেছিস?

– আপনাকে পুরষ্কার দিতে।

– তুই পুরষ্কার দেয়ার কে রে?

– বুড়িমা, তুমি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিচ্ছ। আমার মতই তুমি কাজে দক্ষতা দেখাচ্ছ।

– তোর মতো দক্ষতা দেখাচ্ছি মানে?

– মানে তুমি আমার অনুসারী হিসেবে খুবই সফল।

– ওরে নচ্ছার, আমি তোর অনুসারী হতে যাবো কোন দুঃখে? তুইই বরং আমার অনুসারী।

– তা কী করে সম্ভব। আমি ইবলিস। আমার কাজই হল মানুষে মানুষে হানাহানি, রেষারেষি লাগিয়ে দেয়া। স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটানো।

বুড়ি বলল, 'আরে, এসব আমার চেয়ে ভালো করে আর কে পারে? তা তোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিস না।

– না, পারছি না।

– তাহলে দেখ।

বুড়ি পাশের গ্রামের মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এমন বেশ ধরলো যাতে দেখলেই মনে হয়, বুড়ি অনেক দূর থেকে এসেছে। সবাই নামাযে দাঁড়াল। বুড়ি সুযোগ বুঝে নতুন

দেখে এক জোড়া জুতা বাছাই করল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক পাটি জুতো তুলে নিয়ে কাপড়ের নিচে লুকিয়ে ফেলল।

হাঁটতে হাঁটতে ইমাম সাহেবের বাড়ি এল। দরজার কড়া নেড়ে বলল, 'বাড়িতে কেউ আছে? একজন অসহায় বুড়ি এক গ্লাস পানি খেতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ইমাম সাহেবের স্ত্রী বুড়িকে পরম সমাদরে ঘরে নিয়ে বসাল। শরবত এনে দিল। ঘরে সেমাই ছিল, তাও এনে দিল। বুড়ি চামচ দিয়ে সেমাই খাওয়া শুরু করল। একটু পর বলল, 'মা, আমি যে আবার এক চামচ দিয়ে সেমাই খেতে পারি না। দুটো চামচ লাগে।

ইমামপত্নী আরেকটা চামচ এনে দিল। বুড়ি একবার এক চামচ দিয়ে আরেকবার আরেক চামচ দিয়ে সেমাই খেতে লাগল।

দরজায় টোকা পড়ল। স্ত্রী দৌড়ে গেল। দরজা খুলেই অত্যন্ত খুশির সঙ্গে বলল, 'আমাদের ঘরে একজন মেহমান এসেছেন।

ইমাম সাহেব এসে হাসিমুখে বুড়ির সামনে দাঁড়ালেন। কুশল বিনিময় করে বুড়ির হাল-হাকীকত জানতে চাইলেন।

বুড়ি ইমাম সাহেবকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। জোরে বলে উঠল,

– এ লোক কে? এ বেগানা পুরুষ ঘরের মধ্যে কেন এল?

– বুড়িমা! ইনিই আমার স্বামী। মসজিদের ইমাম সাহেব।

বুড়ি ভীষণ অবাক হয়ে জানতে চাইল,

– ইনিই যদি তোমার স্বামী হন, তাহলে এতক্ষণ যার সঙ্গে বসে সেমাই খাচ্ছিলাম ওটা কে? তাকেও তো তোমার স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছিলে। তোমার স্বামী কয়জন?

ইমাম সাহেব যারপরনেই অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,

– আরেকজন লোক এতক্ষণ ঘরে ছিল?

– হ্যাঁ ছিল। এই তো আরেকটা চামচ। এটা দিয়েই তো আমার সঙ্গে বসে সেমাই খাচ্ছিল। আর ওই যে একপাটি জুতো। দরজার আওয়াজ পেয়েই লোকটা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে। তাড়াহুড়োয় একটা জুতোও ফেলে গেছে।

ইমাম সাহেব দেখলেন তাই তো। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে স্ত্রীর দিকে তেড়ে গেলেন। স্ত্রী ভয়ে ছুটে পালাতে গেল; কিন্তু আলনার সঙ্গে পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। বেকায়দায় পড়ে মাথাটা সজোরে মেঝের সঙ্গে ঠুকে গেল। মাথা ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করল।

কেউ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে স্ত্রী মারা গেল। স্ত্রীর বাড়ির লোকেরা আসল ঘটনা জানতে পেরে ইমাম সাহেবকে মারার জন্য দল বেঁধে রওনা দিল।

এদিকে ইমাম সাহেবের জ্ঞাতি– গোষ্ঠী এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে তারাও লাঠি-বল্লম নিয়ে বের হয়ে এল। পুরো এলাকায় শুরু হল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

বুড়ি এবার ফিরে এল নিজের বাড়িতে। শয়তানকে বলল, 'কী এবার বিশ্বাস হল তো, কে সেরা?'

ভ্রূণ-হত্যা

আল্পনা মাতৃসদন। শহরের নামকরা মা ও শিশু বিষয়ক ক্লিনিক। বিশিষ্ট গাইনি বিশেষজ্ঞ যোবায়দা মির্জা বসে আছেন চেম্বারে। বাইরে রোগীদের প্রচণ্ড ভিড়। একজন মহিলা পর্দা ঠেলে চেম্বারে ঢুকলো।

– বলুন আপনার কী সমস্যা?

– ম্যাডাম! আমাদের দেড় বছরের একটা বাচ্চা আছে; কিন্তু এরই মধ্যে আমি আবার সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছি। আমরা চাচ্ছি, আগের বাচ্চাটাকে আরেকটু বড় করে, তারপর নতুন বেবি নিতে। দুটো বেবি একসঙ্গে লালন-পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন।

– আমি কী সহযোগিতা করতে পারি?

– মানে, আপনার পরামর্শ চাইছি। আমরা এখন কী করতে পারি?

– তার মানে আপনারা চাইছেন, একটা সন্তান রাখতে।

– জি।

– কোনটাকে রাখতে চান?

– কেন, আমাদের দেড় বছরের সন্তানটাকে?

– তার মানে আপনি নতুন বেবিটাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছেন, এই তো?

– এভাবে বলছেন কেন, ওই বেবি তো এখনো জন্মলাভ করেনি।

– কিন্তু আপনি যা চাচ্ছেন, সেটা করতে গেলে আপনারও জীবনাশংকা দেখা দিতে পারে। তার চেয়ে নিরাপদ একটা উপায় অবলম্বন করলে কেমন হয়?

– খুবই ভালো হয়। সেটা কী?

– উপায়টা হল, আপনাদের আগের বেবিটাকে মেরে ফেলা।

– বলছেন কি আপনি, আপনি তো প্রলাপ বকছেন।

– আমি ঠিকই বলছি। আমি যদি অস্ত্রোপচার করি তাহলে মা ও শিশু দুজনেই মারা পড়তে পারেন। তার চেয়ে আগের শিশুটাকে মেরে ফেললে আপনার জীবনহানির আশংকা থাকে না।

– ম্যাডাম! তাই বলে আপনি একটা দেড় বছরের বাচ্চাকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন? আপনি মানুষ না অন্য কিছু? এটা অসম্ভব, এটা হতে পারে না।

– দেখুন, আমি যেটা বলেছি, সেটাই এ সমস্যার উত্তম সমাধান। আর আপনি যেটা করতে চেয়েছেন, সেটাও কিন্তু একটা বাচ্চাহত্যা। উভয়েই আপনার সন্তান। দেড় বছর বয়সী একটা সন্তান আর গর্ভে থাকা সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আপনি চাচ্ছেন একটা সন্তান রাখতে। আমিও আপনার জন্য নিরাপদ একটা সমাধান দিয়েছি।

আগন্তুক মা বুঝতে পারলেন, ডাক্তার যোবায়দা মির্জা কী বোঝাতে চাইছেন। অশ্রুসজল চোখে বললেন,

– অনেক শুকরিয়া ম্যাডাম, আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

অন্ধ ও খোঁড়া

এক গাঁয়ে বাস করত এক খোঁড়া। তার চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হত। পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্যে কোনোমতে তার দিন গুজরান হত। অতীব প্রয়োজন ছাড়া সে ঘর থেকে পারতপক্ষে বের হত না। যেদিন গ্রামের হাটবার সেদিন খোঁড়া লোকটা কষ্ট করে হলেও একবার বাজারে যেত। এ দিন তার বেশ আয় হয়। মানুষ বাজারের দিন অন্যদিনের তুলনায় উদার থাকে। টাকা-পয়সার পাশাপাশি হাটুরেরা তাকে এটা-সেটা কিনে খেতে দেয়। কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে চা দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে সিঙাড়া-জিলিপি খাওয়ায়। এসবের লোভেই শত কষ্ট হলেও খোঁড়া লোকটা বাজারে হাজিরা দেয়।

আজও হাটবার। সকাল সকাল বাজারের উদ্দেশে রওনা দিল। আস্তে আস্তে পথ চলছে। বাড়ি থেকে কিছু দূর আসার পর দেখল, একজন অন্ধ লোক হাতড়ে হাতড়ে বাজারের দিকে যাচ্ছে। তাকে দূর থেকে ডাক দিয়ে থামাল।

– কী ভাই, কোথায় যাচ্ছ?

– এই একটু বাজারে যাচ্ছি।

– তাহলে তো দুজনের গন্তব্য মিলে গেল।

দুজন একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল। সুখ-দুঃখের আলাপ করল। খোঁড়া লোকটা একটা প্রস্তাব দিল অন্ধকে।

– চলো আজ থেকে আমরা দুজন মিলে একটা দল গঠন করি। তুমি চোখে দেখতে পাও না, আমি পথ চলতে পারি না। তুমি আমাকে কাঁধে নিয়ে পথ চলবে, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাব।

– উত্তম প্রস্তাব। চলো, তাই করা যাক।

দুজন পথ চলতে চলতে বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হঠাৎ খোঁড়া লোকটা বলল, 'থামো থামো, সামনে দেখছি রাস্তার ওপর একটা থলে পড়ে আছে।

তারা থলেটা কুড়িয়ে নিল। খুলে দেখে ভেতরে অনেক টাকা।

খোঁড়া লোকটা বলল, 'এই থলের মালিকানা আমার। কারণ আমিই এটাকে দেখেছি।

– অসম্ভব! এই থলে আমার। আমি পায়ে হেঁটে কষ্ট করে এতদূর না আনলে তুমি এত তাড়াতাড়ি আসতেই পারতে না।

তুমুল ঝগড়া লেগে গেল দুজনে। তাদের ঝগড়া দেখে পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক পথচারী কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল। উভয় পক্ষের কথা শুনে লোকটা বলল, 'তোমরা দুজনেই যৌথভাবে এই থলের মালিক। দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই থলে পাওয়া গিয়েছে।

লোকটা এই সমাধান দিয়ে চলে গেল; কিন্তু দুজনের ঝগড়া থামল না। একটু পরে আরেক লোক এল। দুজন মিলে তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে লোকটা বলল, 'তোমরা থলেটা কোথায় পেয়েছ, বলো দেখি?

– ঐ যে ওখানে।

লোকটা টাকাভর্তি থলেটা নিয়ে দৌড় দিল। অনেক দূরে গিয়ে আগের মতো ছুটতে ছুটতে বলল, 'তোমাদের মধ্যে যে আমাকে আগে ছুঁতে পারবে, সেই থলের মালিক হবে।

মিথ্যার শাস্তি

শায়খ হাম্মাদ তাইমি। বিখ্যাত দাঈ। দ্বীন প্রচারের জন্য আফ্রিকা মহাদেশকে বেছে নিয়েছিলেন। কালো আফ্রিকার সবুজ বনে-বাদাড়ে, অক্লান্তভাবে ঘুরে ঘুরে, দাওয়াতি কার্য চালিয়ে গেছেন। তার হাত ধরে, পিগমী, জুলু, হুতু, টুটসি উপজাতির অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

দিনলিপির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,

একদিন সকালে বসে আছি। নাইজারের বিখ্যাত ঘাণ্টু নদীর তীরে। খেয়া পারাপারের ঘাটের কাছে। একটা জরাজীর্ণ দোচালায়। নদী পারাপারের একমাত্র খেয়াটা ওপারে গেছে আরোহী নিয়ে। ওটার অপেক্ষাতেই আছি। অলস দৃষ্টিতে এদিক সেদিক তাকাচ্ছি। এমন সময় দেখলাম, আমার সামনে একটা মরা ঘাসফড়িং পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর একটা লাল ডেঁয়ো পিঁপড়া এল। ঘাসফড়িংটার চারপাশে কিছুক্ষণ চক্কর দিল। চক্কর শেষে ফড়িংটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করল; কিন্তু ফড়িংটা পিঁপড়ার তুলনায় অনেক বড়। জায়গা থেকে নাড়াতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর পিঁপড়াটা হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

সেটা কোন দিকে যাচ্ছে লক্ষ্য রাখলাম। একটু পরে, ওটা আরো কিছু পিঁপড়া নিয়ে ফিরে এল। আমার মাথায় দুষ্টুমি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি করে ফড়িংটাকে সরিয়ে রাখলাম। পিঁপড়াগুলো কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ফিরে গেল। ফড়িংটাকে আগের জায়গায় রেখে দিলাম।

বড্ড কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করছিলাম, পিঁপড়াটা আবার আসে কিনা। অবাক কাণ্ড! একটু পরে, সেটা আবার এল। ফড়িংটাকে টানাটানি করে দেখল, নাড়াতে না পেরে ফিরে গেল। আবার দলবল নিয়ে ফিরে এল। আমি আবারও ফড়িংটাকে সরিয়ে রাখলাম। পিঁপড়াগুলো কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করে রণে ভঙ্গ দিল।

আবার ফড়িংটাকে জায়গামতো রাখলাম। পিঁপড়াটা অনেকক্ষণ পর আবার এল। ফড়িংটাকে একবার শুঁকে দেখে, ফিরে গেল। একটু পরে, সঙ্গে করে আগের চেয়েও বেশি পিঁপড়া নিয়ে হাজির হল। আমি আবারও ফড়িংটা সরিয়ে রাখলাম। পিঁপড়াগুলো চারপাশে অনেক খুঁজল। কিছু না পেয়ে, সবগুলো পিঁপড়া এবার সংবাদবাহী পিঁপড়াকে হামলা করল। ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

আমি থ হয়ে গেলাম। পিঁপড়াটা আমার কারণেই মারা গেল। বারবার ধোঁকা খেয়ে, অন্যরা মনে করেছে, প্রথম পিঁপড়াটা মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। মিথ্যা কথা বলেছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, তাহলে পিঁপড়া সমাজেও মিথ্যা বলাটা চরম অপরাধ? মিথ্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড? অথচ আমরা মনুষ্যসমাজ অহরহ মিথ্যার বেসাতি করে চলেছি!

ফায়ার-কিশোর

বাবা ছিলেন ফায়ারসার্ভিসের কর্মকর্তা। প্রতিদিন বাড়ি ফিরেই ছেলের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের গল্প করতেন। বাবার দেখাদেখি ছেলে মনেও 'আগুন' বিশেষ স্থান দখল করে নিল। বাবা এক অপারেশানে গিয়ে আর ফিরলেন না। দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। সরকার বিধবা-এতিমকে আগের কোয়ার্টারেই থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

বাবা চলে গেলেও, ছেলের মনমুকুরে আগের ছাপ রয়ে গেল। তার খেলার বিষয়ও একটা; আগুন নেভাবে। স্কুল থেকে ফিরেই একটা বালতি আর পাইপ নিয়ে ঘরময় ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। কল্পিত আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবার পুরনো একটা হেলম্যাটও মাথায় পরতে ভোলে না। মা এসব দেখেন আর আড়ালে চোখের পানি ফেলেন। ছেলেটাও না জানি স্বামীর পরিণতি বরণ করে! অজানা আশঙ্কায় মায়ের মনটা দুলে ওঠে।

যেমনটা ভাবা গিয়েছিল, হুবহু তেমনটা না হলেও, আশংকা পুরোপুরি অমূলকও হল না। ছেলেটার শরীরে এক দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিল। মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ছেলেটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। তবুও তার প্রিয় খেলা বন্ধ নেই। তার এখনো ইচ্ছে, সে তার বাবার মতো হবে।

দুর্বল শরীরে ছোটাছুটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খেলার বিরাম নেই। এক দিন ছেলেটা নেতিয়ে পড়ে। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকে। ডাক্তার বলেছেন,

– শেষ ক'টা দিন তাকে আনন্দে থাকতে দিন। তাতে যদি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা, বাঁচার পরিধিটা একটু হলেও বাড়ে!

ছেলে নতুন এক বায়না ধরল,

– আম্মু! আমি সত্যি সত্যি আগুন খেলব।

– সে তো বাবা সম্ভব নয়। ঘরে আগুন দিলে যে আমি-তুমি পুড়ে যাব।

– ঘরে কেন? ওই যে আব্বুদের মাঠে সবাই সত্যি সত্যি খেলে সেখানে।

– তারা তো ট্রেনিং দেয় সেখানে! তোমাকে সেখানে যেতে দেবে না।

– তুমি একটু বলে দেখো না!

মা ছেলের মনরক্ষার্থে অফিসে গেলেন। দায়িত্বরত অফিসারের কাছে ছেলের অবস্থা খুলে বললেন। অফিসার রাজি হলেন। তবে আগামী সপ্তাহে। বিষয়টা ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো হল। আগামী সপ্তাহের মহড়ায় একটি কিশোর অংশগ্রহণ করতে চায়। তার

পিতা ছিলেন...। মৃত্যুপথযাত্রী এক কিশোরের আর্তি কেইবা ফেলতে পারে! তার ওপর ছেলেটা তাদেরই পরিবারের সদস্য।

নির্দিষ্ট দিনে আয়োজিত হল 'ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ'। ব্যাপক আয়োজন। বিশাল মাঠে বানানো হল প্রকাণ্ড এক 'ডামি প্রাসাদ'। ফায়ারম্যানরা সবাই প্রস্তুত। প্রয়াত সহকর্মীর সন্তানকে আজকের প্রধান অতিথি বানানো হল। অতিথি হলেও, তাকেও আজকের মহড়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হল। কিশোর তো মহাখুশি। আব্বুর পুরনো সঙ্গীরা তাকে অফিসারের মতো সম্মান দিয়েছে। সবাই তাকে পুরো সময়টা আগলে রেখেছে। সব কাজ তাকে দিয়েই শুরু করিয়েছে। সাইরেন থেকে শুরু করে, পানি ছিটানোর সুইস, অগ্নিনিরোধক পোশাক পরে আগুনের একদম কাছাকাছি যাওয়া আরও অনেক স্বপ্নের ইচ্ছাগুলো একদিনেই পূরণ হবে, কল্পনাতেও আসেনি।

মায়ের চোখেও আনন্দাশ্রু চিকচিক করছে। ছেলেটার এতদিনের আশা কিছুটা হলেও পূরণ হল। সত্যি সত্যি আগুন নেভানোর কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে।

সবার মুখে এখন কিশোরের নাম। তার অসুখের কথা শুনে সবার মন খারাপ। মহড়ার পরে কিছুদিন খুবই আনন্দে কাটল। ডাক্তার মা-কে একদিন বলে দিলেন,

– ছেলেকে হাশিখুশি দেখালেও, এটা শেষের শুরু! আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন।

এর তিন চারদিন পর এক বিকেলে কিশোরের পেটে প্রচণ্ড বেদনা উঠল। গলাকাটা মুরগির মতো দাপাতে-তড়পাতে লাগল। ফায়ারসার্ভিসের অ্যাম্বুল্যান্স এসে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ব্যাথা কমার কোনো আলামত বোঝা গেল না।

কর্তৃপক্ষ ঠিক করল, ছেলেটাকে শেষবারের মতো একবার আনন্দ দেবে। তারা পুরো কম্পাউন্ড ঘিরে একটা আয়োজন করল। হাসপাতালের অন্যদের জানিয়ে দেয়া হল, না ঘাবড়াতে। এটা একটা কৃত্রিম অপারেশন।

ছেলেটা বিছানায় ছটফট করছে। এরই মধ্যে সে দেখল হাসপাতালের সামনে আগুন লেগে গেছে। ফায়ারম্যানরা ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। কিশোরের সেবায় নিয়োজিত নার্স জানাল, তার জানালার কাছেও আগুন এসে গেছে। পুরো হাসাপাতাল এখন অবরুদ্ধ। সবাইকে জানালা দিয়েই উদ্ধার করা হচ্ছে। তাকে নেয়ার জন্যেও একদল ফায়ারম্যান পাইপ বেয়ে উঠে আসছে।

– সত্যি!

– একটু পরেই দেখবে।

প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও কিশোর অদম্য কৌতূহল নিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। ক্ষণে ক্ষণে তার চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছিল তার শরীর। শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে, কখন তাকে নেয়ার জন্যে আসবে। জানলার শার্সির ওপাশে কী যেন নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে একটা কপাট খুলে গেল। একজন ফায়ারম্যান! পুরোদস্তুর অপারেশনের ইউনিফর্ম পরিহিত। তার একটা হাতে একগুচ্ছ ফুল! আগন্তুকের চেহারার দিকে তাকাতেই কিশোরের চোখ ছানাবড়া! কেমন যেন আব্বুর মতো লাগছে মানুষটাকে! তার মুখেও অনাবিল হাসি! বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ঠোঁটের কোণে ফুটে আছে ব্যথাক্লিষ্ট করুণ হাসি। চোখের দৃষ্টিটা স্থির। অকম্প। নিস্পন্দ।

অসমান্য দৃঢ়তা

ফুয়াদ মুহাইসিনি। সউদি গেজেট পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা। তিনি লিখেন,

সেবার, ওআইসি সম্মেলন কাভার করার জন্য জিদ্দা যাচ্ছিলাম। জিদ্দার উপকণ্ঠে পৌঁছার ঠিক আগমুহূর্তে আমাদের সামনের দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। গাড়ি থামিয়ে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম চালক স্টিয়ারিং হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। নিথর নিস্পন্দ। দুহাত দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল আঁটোসাঁটো করে ধরে রাখা। শাহাদাত আঙুলি বিস্ময়করভাবে সোজা হয়ে আছে, শেষ মুহূর্তের কালিমা পাঠের প্রমাণস্বরূপ। আমরা ধরাধরি করে শোয়ালাম। মুখের অভিব্যক্তিতে ব্যথার কোনো আলামত নেই। দুঠোঁটে যেন সামান্য হাসি লেগে আছে। এগিয়ে গিয়ে চোখদুটো বন্ধ করে দিলাম।

সবচেয়ে কষ্ট লাগলো যেটা দেখে তা হল, চালকের পাশেই একটা ছোট্ট মেয়ে পড়ে আছে। পুরো শরীরটাই রক্তে ভেজা। মাথা ফেটে গেছে। বাবার সাথেই বোধহয় মারা গেছে। দৃশ্যটা দেখে আমার কান্না চলে এল।

আমরা সামনের আসনের দুজনকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। পেছনের আসনের দিকে তাকানোর কথা খেয়াল ছিল না। আমার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। একটা আওয়াজ এল। পেছনের আসন থেকে। অবাক হয়ে তাকালাম। আমার কল্পনাতেও ছিল না, পেছনে কেউ থাকতে পারে। গাড়িটার ছাদ এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল যে সামনের অংশটা পেছনের অংশ থেকে আড়াল হয়ে গিয়েছিল।

একজন মহিলার আওয়াজ এল। ভাই, আমাদেরকে একটু বের করে আনুন। আমরা পেছনে আটকা পড়েছি। আমরা পেছনের দরজাটা অনেক কষ্টে খুললাম। ভেতরের দৃশ্য দেখে চমকে গেলাম। একজন বোরখাবৃতা মহিলা বসে আছেন। তার পাশে দুটি বাচ্চা মেয়ে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বসে আছে। আমার কান্না দেখে মহিলা উল্টো আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন,

– আমার স্বামী অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন।

সবাই মনে করতে লাগল, দুর্ঘটনা যেন আমারই হয়েছে। মহিলা সম্পূর্ণ ধীরস্থির, শান্ত আচরণ করছে। এতবড় দুর্ঘটনার কোনো প্রভাব তার কথায় প্রকাশ পেল না। মহিলা

বলল, 'আপনারা দয়া করে আমার স্বামী-সন্তানের জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিন। যত দ্রুত সম্ভব কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা ফোন করলাম। কিছুক্ষণ পর একটা অ্যাম্বুলেন্স এল। লাশ ওঠানো হলে, মহিলাকেও অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে বলা হল। অবাক কাণ্ড! মহিলা উঠতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, 'অ্যাম্বুলেন্সে যে চারজন পুরুষ আছে, তারা সবাই গায়রে মাহরাম। তাদের সঙ্গে এক গাড়িতে যাবে না। মহিলা আছে এমন কোন গাড়ি পেলে সেটাতে চড়ে যাবে।

আমার পড়লাম বিপাকে। মহিলা আছে এমন গাড়ি মিলছিল না। এদিকে অ্যাম্বুলেন্স চলে গেছে অনেক আগে। আমরাও মহিলা আর অসহায় দুটো বাচ্চাকে এভাবে একা একা রেখে চলে যেতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ পর একটা গাড়ি পাওয়া গেল। একজন লোক তার বউ-বাচ্চাসহ শহরের দিকে যাচ্ছে। মহিলাকে সে গাড়িতে তুলে দিলাম।

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, গাড়িটার অপসৃয়মান ব্যাক লাইটের দিকে। ভাবছিলাম, এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও কেউ নিজেকে এতটা ধরে রাখতে পারে? নিজের পর্দার কথা খেয়াল থাকে? স্বামী নেই। একটা ফুটফুটে সন্তানও মারা গেছে। তারপরও মহিলা নিজের আত্মসম্মান, দ্বীনদারি ও তাকওয়া ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। এমন অবস্থায় তো অনেক শক্ত পুরুষও নিজেকে সামলাতে পারবে না; অথচ এ মহিলা দিব্যি কতোটা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে।

অতিভক্তি

স্বামী বাজার থেকে এসে দেখে, স্ত্রী বসে বসে কাঁদছে! নতুন বিয়ে করা বউ, এভাবে কাঁদলে কার ভালো লাগে! ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাছে গেল। আদর করে চোখের পানি মুছে দিল। সোহাগভরে জিজ্ঞাসা করল,

– কাঁদছ কেন? বাড়ির কথা মনে পড়েছে বুঝি!

– জি না!

– কেউ কিছু বলেছেন?

– জি না।

– আমার কোনো আচরণে কষ্ট পেয়েছ?

– না না।

– তাহলে?

– আমি ছোটবেলা থেকেই খাস পর্দা করতে অভ্যস্ত! বেগানা পুরুষ তো দূরের কথা, একটা পক্ষীও আমার চেহারা দেখেনি! আজ বেখেয়ালে উঠোনে বের হয়েছিলাম। আতা গাছে একটা চড়–ই পাখি বসা ছিল, সেটা আমাকে দেখে ফেলেছে।

স্বামী তো খুশিতে বাগবাগ! আল্লাহু আকবার! সুবহানাল্লাহ! কী পর্দানশীন! আল্লাহ আমাকে এমন হীরের টুকরো বউ দিয়েছেন!

– ওগো, তুমি একদম চিন্তা করবে না। এই দেখো, আমি কুঠার নিয়ে বের হলাম। গাছটাই সমূলে কেটে ফেলব। দেখি কোন পাখির সাধ্য আমার বউয়ের মুখ দেখে!

একদিন বিশেষ কাজ থাকায়, স্বামী অসময়ে ঘরে ফিরে এল। নিজের কামরায় ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খেল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! ভেতর থেকে অপরিচিত এক পুরুষের আওয়াজ আসছে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। যা দেখল, তাতে স্বামীর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল।

মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে স্বামী এলাকা ছেড়ে চলে গেল। যেতে যেতে দূর এক গাঁয়ে গিয়ে হাজির হল। ক্ষুৎপিপাসায় কাহিল অবস্থা। সামান্য দানাপানি না হলে আর চলছে না। গ্রামের লোকেরা তখন দলে দলে কোথাও যাচ্ছিল। স্বামীও তাদের সঙ্গে জুড়ে গেল।

– আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

– গ্রামের মোড়লের ঘর চুরি হয়েছে! তিন গাঁয়ের সালিসরা এসেছেন। চোরাই মাল উদ্ধার করার জন্য গ্রামের সবাইকে মোড়লের বাড়ির উঠোনে হাজির হতে বলা হয়েছে।

সব লোক হাজির! একজন ছাড়া। তিনিই আজকের প্রধান অতিথি। মোড়ল তাকে আনার জন্যে লোক পাঠালেন। স্বামী দেখল, এক বৃদ্ধ লোক অতি সতর্ক পদক্ষেপে, ধীরে ধীরে আসছে।

– তিনি এত আস্তে আস্তে হাঁটছেন কেন?

– আপনি নতুন এসেছেন, তাই আমাদের শায়খকে চেনেন না। অত্যন্ত আল্লাহওয়ালা লোক! সারাক্ষণ যিকির-ফিকিরে থাকেন। কারো মনে কষ্ট দেন না। এমনকি কোনো প্রাণীকেও কষ্ট দেন না। দেখছেন কত আস্তে আস্তে সতর্ক পদক্ষেপে হাঁটছেন?

– কেন এভাবে হাঁটছেন?

– তিনি চেষ্টা করছেন, তার পায়ের নিচে যেন কোন পিঁপড়াও না পড়ে। গুনাহ হবে যে। তিনি সবসময় অতি উচ্চস্তরের বুযুর্গির কথা বলেন। আমাদেরকে মানতে বলেন।

স্বামী কথাটা শুনে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কী ভেবে শায়খের কাছাকাছি গিয়ে, ভাল করে শায়খের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। তারপর মোড়লকে গিয়ে বলল, 'আমি কি আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারি?

– জি বলুন।

– আমি জানি, আপনার ঘরে কে চুরি করেছে।

– আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না।

– আমি এই গাঁয়ে নতুন এসেছি। বাকি কথা পরে জানাব! আপনি চোরের সন্ধান চাইলে আমি একটা উপায় বলতে পারি।

– জি জি, বলুন।

– আপনি আমার কথা অবিশ্বাস না করে, ওই শায়খের ঘরে গিয়ে একবার তল্লাশি চালিয়ে আসুন। আমি প্রায় নিশ্চিত, আপনার ঘরে ওই শায়খই চুরি করেছে।

– কী বলছেন আপনি! এ অসম্ভব। আপনি পাগল না হলে এমন কথা বলতেন না।

– আচ্ছা, একবার অন্তত যাচাই করে দেখুন।

মোড়ল কাউকে বুঝতে না দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত শায়খের বাড়িতে গেলেন। শায়খ এখানে একা থাকেন। ভিন গাঁয়ে তার পরিবার পরিজন থাকে। মোড়ল ঘরের প্রতিটি কোণ তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। নিরাশ হয়ে বের হয়ে আসবেন, এমন সময় জায়নামাযের ওপর পা পড়তেই কেমন যেন ঠেকল। জায়নামায উঠিয়ে দেখলেন, একটা ঢাকনা। নিচে

গর্ত। অগণিত টাকাপয়সা, স্বর্ণ-অলঙ্কার থরে থরে সাজানো! স্ত্রীর হারটা চিনতে একটুও কষ্ট হল না। কারণ হারটা যে তার মায়ের দেয়া!

মোড়ল যেভাবে এসেছিলেন, ঠিক সেভাবে সন্তর্পণে ফিরে এলেন। ভিনদেশী মানুষটাকে খুঁজে বের করলেন। যাওয়ার সময় তাকে গ্রাম-প্রহরীর যিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন।

– আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন, ভণ্ড শায়খই চোর?

– অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, যারাই অতি ধার্মিকতা প্রকাশ করে, শরীয়ত তাকওয়ার যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা ছাড়িয়ে আরও অনেক বেশি তাকওয়া প্রকাশ করে, আর মুখে সীমাতিরিক্ত বুযুর্গির কথা বলে, তারা আসলে নিজেদের গোপন পাপ ঢাকার জন্যই এমনটা করে থাকে।

বাবার সেবা

বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। চলাফেরা করতে পারেন না। তিন ছেলেই সেবাযত্ন করে। দেখাশোনা করে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, বুড়ো বাবা আর বেশিদিন বাঁচবেন না। বাবার প্রতি ছোট ছেলের টানটা একটু বেশি। ভাইদের কাছে আবেদন করল,

– শেষ কয়টা দিন আমি একা একা বাবার খেদমত করতে চাই।

– না, তা হতে পারে না। তুমি একা একা সব সওয়াব নিয়ে যাবে।

– সুযোগটা দিলে, আমি 'মিরাস' নেব না! তোমরাই আমার ভাগেরটা নিয়ে নিও।

– তাই! তাহলে ঠিক আছে।

স্বামী-স্ত্রী মিলে বাবার নিবিড় সেবাযত্ন করল। বাবা খুব আরামে শেষ দিনগুলো কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। মারা যাওয়ার আগে বাবা পুত্রবধূর হাতে গোপনে তিনটা চিরকুট দিয়ে গেলেন। পরপর তিনদিনে সেগুলো খুলতে বললেন।

পরদিন প্রথম চিরকুট খোলা হল। লেখা আছে,

> অমুক স্থানে কিছু মোহর রাখা আছে। সেগুলো তুলে নিও। তোলা হল। সততার কারণে বড় দুই ভাইকে খবরটা জানাতে ভুলল না।

– তুমি মিরাস নিবে না বলেছিলে না! তাহলে মোহরগুলো তোমার পাওনা নয়। এটা আমাদেরই প্রাপ্য।

পরদিন আরেকটা চিরকুট খোলা হল। এবারও আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ছোট ছেলে মন খারাপ করে ভাইদের বাড়ি থেকে ফিরে এল।

তৃতীয় চিরকুট খোলা হল,

> বাবা, অমুক স্থানে একটা মোহর রাখা আছে। সেটা নিয়ে আসবে। তারপর আমার পালঙ্কের নিচে মাটি খুঁড়ে দেখবে।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মোহরটা নিয়ে এল। আগের মতোই ভাইদের কাছে গিয়ে সংবাদ জানালো,

– মাত্র একটা মোহর? এটা দিয়ে আমরা কী করবো? যাও, এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।

বিষণ্নমনে বাড়ি ফিরছিল। এক বুড়ি বড় বড় দুটি মাছ নিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। কাঁদতে কাঁদতে।

– বুড়ি মা, কাঁদছ কেন গো!

– আর বলো না, কত কষ্ট করে মাছ দুটো ধরলাম। কিন্তু বাজারে বিকোল না। তুমি নেবে?

– আমার কাছে তো মাত্র একটা মোহর আছে।

– মোহর! এ যে আশাতীত মূল্য? তুমি এক মোহর দিয়ে মাছদুটো কিনবে?

– জি।

বউ মাছ কুটতে বসল। প্রথমটার পেট কাটার পর বিরাট একটা মোহর বের হল। দ্বিতীয় মাছের পেট থেকে আরেকটা বের হল। আনন্দে আটখানা হয়ে স্বামীকে বলল। মনে পড়ল, বাবা খাটের তলা খুঁড়তে বলেছেন। জামাই-বউ দৌড়ে ঘরে এল। মাটি খুঁড়ে দেখা গেল, একটা মাটির ঘড়া। মুখটা বন্ধ। ওপরে একটা চিরকূটে লেখা,

অতি প্রয়োজন ছাড়া এটা খুলো না। এটার কথা কাউকে বলো না।

ইহুদিদের চরিত্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। নাজি সৈন্যদের হাতে কিছু রুশ সৈন্য বন্দী হল। তাদের মধ্যে একজন হল বরিস। সে বন্দী থাকাকালে, প্রতিদিন দিনলিপি লিখত। এক দিনের দিনলিপিতে সে লিখেছে,

> আজ আমাদের বন্দীজীবনের বিশতম দিন পার হল। আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আমাদের বন্দী শিবিরটা অষ্ট্রিয়া সীমান্তে। এটা একটা গ্যাস চেম্বার। প্রতিদিন এখানে অনেক ইহুদিকে ধরে আনা হয়।

এভাবে আস্তে আস্তে পুরো বন্দী শিবিরটা ইহুদিতে ভর্তি হয়ে গেল। কারাকর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল, কিছু বন্দী কমিয়ে ফেলবে। আমরা যারা রুশ বন্দী, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হল। কিছুক্ষণ পর সেখানে অনেক ইহুদিকেও নিয়ে আসা হল। উভয় দলকে একটা গর্ত খুঁড়তে বলা হল। হাড়ভাঙা খাটুনি করে গর্ত খোঁড়া হল। কাজ শেষ হলে আমরা যারা রুশ ছিলাম তাদেরকে বলা হল, 'তোমরা গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসো।'

আমরা বেরিয়ে এলাম। আমাদেরকে বলা হল, 'এবার তোমরা গর্তে মাটি ফেলো। গর্তের ভেতরের ইহুদিদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলো।'

আমরা এই অমানবিক কাজ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলাম। জার্মান সেনা অফিসার রেগে গেলেন। আমাদেরকেই এবার গর্তে নামতে বললেন। ইহুদী বন্দীদেরকে গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে বললেন। তাদেরকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা এই রুশ সৈন্যদের ওপর বেলচা দিয়ে মাটি ফেলো। তাদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলো।'

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, ইহুদীর বাচ্চাগুলো নির্বিকারচিত্তে আমাদের ওপর মাটি ফেলতে উদ্যত হল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। তাদের চেহারায় কোনোরকমের অনুশোচনাও দেখা গেল না। তখন জার্মান অফিসার বললেন, 'এই তোমরা থামো, মাটি ফেলতে হবে না।'

অফিসার আমাদেরকে গর্ত ছেড়ে উঠে আসার হুকুম দিয়ে বললেন, 'দেখলে তো! এরাই হল ইহুদির জাত। এদের স্বভাবই এমন। এজন্যই হের ফুয়েরার এডলফ হিটলার এদেরকে নির্মূল করতে চাইছেন। তিনি আরো বলেছেন:

আমি যেখানে যত ইহুদি পেয়েছি, সব মেরে সাবাড় করে দিয়েছি। শুধু কিছু ইহুদি জীবিত রেখে দিয়েছি, যাতে পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে আমি কেন ইহুদিদের প্রতি এমন খড়গহস্ত হয়েছি।

তিন কইন্যা

ঈসা আর ফাহ্দ। পাশাপাশি ঘর। ছেলেবেলা থেকেই দুজনের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা। লেখাপড়া। খেলাধুলা। বিয়েশাদি। সংসারজীবন। এমনকি সন্তানও কাছাকাছি সময়ে হল। কয়েকদিনের ব্যবধানে।

দুজনেই সারাদিন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। বাবা হওয়ার ক'দিন পর দু'জনের দেখা।

ঈসা : তোমার নাকি সন্তান হয়েছে?

ফাহ্দ : আল্লাহ আমাকে একটা মেয়ে উপহার দিয়েছেন। নাম রেখেছি নাওরাহ।

ঈসা : ও, মেয়ে!! আমার তো মাশাআল্লাহ একটা ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছি মুহাম্মাদ। আমাকে এখন সবাই মুহাম্মাদের আব্বু বলে ডাকবে।

দিন গেল। রাত হল। মাস ফুরাল। বছর গড়াল। আরও কিছুদিন পর দুজনের আবার সন্তান হল। ঈসা দৌড়ে এসে জানতে চাইলো,

– তোমার কী হল? আমার তো আবারও ছেলে হয়েছে।

– আল্লাহ আমাকে আরেকটা 'ফুল' দান করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

– পরপর দুটো ছেলে হওয়ার মানে কী দাঁড়াল বলতে পারো?

– না, বলো দেখি।

– আমাদের গাঁয়ের বুড়োরা বলতেন, 'যে মহিলা পরপর দুটি ছেলে জন্ম দিল, সে তার মোহরানার হক আদায় করে ফেলল।' আমার স্ত্রী এখন তার দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায়ই আদায় করেছে, কী বলো?

দ্বিতীয় সন্তানও বড় হল। সময়ের আবর্তনে দুই বন্ধু তৃতীয় সন্তানের পিতা হল। ঈসার আনন্দ আর ধরে না। বন্ধুকে বললো,

– তোমার জন্যে সত্যিই আফসোস হয়। একটাও পুত্রসন্তান পেলে না।

– আফসোস কেন? আমরা তো কন্যাসন্তানই পছন্দ করি।

– তিনটা ছেলে হওয়ার মানে কি জানো?

– না তো!

— তিন ছেলে হওয়ার অর্থ হল, চুলায় বসানো খাবারের ডেগের ওপর বাবা-মার বসে থাকা। যখন ইচ্ছা পাতে বেড়ে খাবে। মেয়ের বাবা-মায়ের তো এ-সুবিধে নেই। হা হা। জানোই তো, ছেলের বাবা ভরপেট খেয়ে ঘুমায়। আর মেয়ের বাবা ক্ষুধায় জেগে থাকে।

অনেক দিন পর।

দুই বন্ধুর এখন বয়স হয়েছে। ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। দুর্বল শরীরে আগের মতো ঘর থেকে বের হওয়া যায় না। দেখা-সাক্ষাতও হয় না। একদিন মেয়ের বাবা বাজারে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, বন্ধু ঈসা উঠোনে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। ময়লা একটা ফতুয়া পরা। শরীর একদম ভেঙে গেছে। বেশ বুড়িয়ে গেছে। সহাস্যে এগিয়ে গিয়ে কুশল জানতে চাইল,

— আছো কেমন! এ-অবস্থা কেন তোমার?

— আর বলো না। শরীর আগের মতো চলে না। তোমার ভাবীও খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। রান্নাবান্নাও ঘরে ঠিকমতো চড়ে না।

— কেন ছেলেরা?

— ওদের কথা বলো না! তারা বিয়ে করে সবাই যে যার মতো আলাদা সংসার পেতে নিয়েছে; কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হয় বেশ সুখেই আছ। মনে হয় তুমি বয়েসে আমার চেয়ে কতো ছোট! তোমার মেয়েদের তো সবার বিয়ে হয়ে গেছে। বুড়োবুড়ি একা একা থাকো কী করে? আমাদের মতো কষ্ট হয় না?

— না তেমন কষ্ট হয় না। মেয়ে তিনটেরই বিয়ে কাছে-ধারে হয়েছে। জামাইরাও ভালো পড়েছে। বড় মেয়েটা সকালের দিকে আসে। আমাদের নাস্তার ব্যবস্থা করে। ঘরদোর ঝাঁট দেয়। রাতের বাসি থালাবাসন ধুয়ে-মুছে রাখে। ধোয়ার জামাকাপড় থাকলে, সাবান দিয়ে ভিজিয়ে রাখে।

দুপুরের দিকে মেঝ মেয়ে আসে। দুপুরের খাবারটা প্রস্তুত করে দিয়ে যায়। কখনো সে ঘর থেকেই রান্না করে নিয়ে আসে। আমাদেরকে গোসল করায়। খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সন্ধ্যার মুখে মুখে ছোট মেয়ে আসে। রাতের খাবার চড়িয়ে দেয়। বিকেলে কিছু খেতে ইচ্ছে হলে, ঝটপট তৈরি করে দেয়। মাকে ওষুধপথ্য খাওয়ায়। সবকিছু গুছিয়ে চলে যায়। এর অর্থ কি জানো?

— না এখন কি অর্থ বোঝার বয়েস আছে?

— এর অর্থ হল, মেয়ের বাবা ভরপেট খেয়ে ঘুমায়। আর ছেলের বাবা ক্ষুধায় জেগে থাকে।

একচোখা ও রঙাবাবু

আল্লাহর পরীক্ষা যে কতোভাবে আসে, বান্দা বুঝতেও পারে না। অনেক চাওয়ার পর একটা সন্তান দিলেন আল্লাহ। বাবা-মায়ের গোপন আক্ষেপ, এর চেয়ে নিঃসন্তান থাকাই যে ভালো ছিল। একটা সন্তান যাও হল, এর চেয়ে না হওয়াই ভালো ছিল। ছেলেটা একচোখা। চোখটা আবার কপালের মাঝ বরাবর। দেখতে বিকট লাগে। গা ছমছম করে ওঠে। মনের মধ্যে কু গেয়ে ওঠে কিছু একটা।

মায়ের মন তো! এমন ছেলেকেও বুকে জড়িয়ে নিলেন। আদর যত্নে মানুষ করে তুলতে লাগলেন। পড়ার বয়স হল। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বেশিদিন টিকল না। একচোখা ছেলে দেখে সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। সহপাঠিরা নানাভাবে উত্যক্ত করে। ভর্তি করানোর সময়ই প্রধান শিক্ষক ছেলেটাকে নিতে চাননি। ছেলেরা ভয় পাবে বলে। এবার ছেলেটা নিজে থেকেই স্কুলে আসতে চাচ্ছে না। সঙ্গীরা তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। দুঃখিনী মা কী আর করবেন। ছেলেকে ঘরে বসিয়ে বসিয়ে যা পারেন শেখান।

বাবা-মা বুদ্ধি-পরামর্শ করে, ছেলেটাকে এক কাঠমিস্ত্রির দোকানে দিলেন। কাজ শিখুক। কিছু করে খেতে হবে তো! ওস্তাদ এমন একচোখা ছেলেকে দেখে প্রথমে স্রেফ না করে দিলেন। পরে মায়ের জোরাজুরিতে রাজি হলেন। ছেলেটা দেখতে শুনতে অন্যরকম হলেও, কাজের বেলায় দেখা গেল বেশ চটপটে। একবার দেখেই একটা ডিজাইন শিখে ফেলে। কাজ শিখতে বেশিদিন লাগল না। ওস্তাদের অধীনেই কাজ করে যেতে লাগল। রুজি-রোজগার ভালোই হতে লাগলো।

ওস্তাদের বয়স হয়ে গেছে। এখন আর আগের মতো কাজ করতে পারেন না। শুধু অর্ডার গ্রহণ করেন আর ডেলিভারি দেন। বাকি সব কাজ শাগরেদই করতে লাগলো। আরো কিছুদিন যাওয়ার পর, ওস্তাদ পাকাপাকিভাবে কাজ থেকে অবসর নিলেন। শাগরেদকে দোকান বুঝিয়ে দিলেন। মাসে মাসে কিছু একটা দিলেই হবে। বুড়ো-বুড়ির দিন গুজরান হয়ে যাবে। সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। এতদিন তো গ্রাহকরা কথাবার্তা বলতো ওস্তাদের সাথে। একচোখা শাগরেদের মুখোমুখি হতে হতো না। এবার ক্যাশে বসার কারণে, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ব্যাপারটা মানুষজন সরলভাবে নিতে পারল না। অর্ডার কমে যেতে লাগল। অন্যান্য আনাড়ি কাঠমিস্ত্রিদের রমরমা লেগে গেল। বাবা-মা

চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন, বাবাই ক্যাশে বসবেন। ছেলে আগের মতো কাজ দেখবে। আড়াল থেকে অর্ডারটা ভাল করে শুনে নিলেই হবে।

দোকান আর বাসা, এ-দুই চক্রের মধ্যেই জীবন ঘুরপাক খেতে লাগল। বাইরে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। কোথাও যেতে ইচ্ছেও হয় না। কী দরকার মানুষের বাঁকা দৃষ্টির অনলে জ্বলার! ছেলেবেলা থেকেই তার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। ভাই-বোন তো নেই-ই। একা থাকতেই বেশি ভাল লাগে। মায়ের সঙ্গে গল্প করে। বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক আলাপ করে। বেশ তো কেটে যাচ্ছে দিন!

পাশের বাসাটা ছিল এক প্রবাসীর। খালিই পড়ে থাকে। শোনা গেল সে বাসা আর খালি থাকবে না। ভাড়াটে উঠবে। দিনকতক পরে এক পরিবার এসে উঠল। জানা গেল, তারা বিশেষ এক উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। আম্মু বললেন,

– তোর জন্যেই তারা এখানে থাকতে এসেছে?

– আমার জন্যে? অবাক করা ব্যাপার তো?

– হ্যাঁ, সত্যি সত্যি তাই।

– কেন?

– তাদেরও একটা ছেলে আছে। গায়ের রঙটা কেমন যেন। কালো-শাদা আর সবুজের মিশেল! তাকালে গা-টা কেমন গুলিয়ে ওঠে। ঘেন্না লাগে।

– তা আমার সঙ্গে তার কী?

– ছেলের মা বলল, তার ছেলেকে কেউ দেখতে পারে না। পছন্দ করে না। উল্টো ঘৃণা করে। তার কোনো বন্ধু নেই। বেচারা একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে। তার একটা বন্ধু না হলে, শিঘ্রই পাগল হয়ে যাবে। তোর কথা লোক মারফতে শুনে ভেবেছে তুই ওর বন্ধু হবি!

– আমি কেন তার বন্ধু হতে যাব?

– তোরও কোন বন্ধু নেই, শুনেছে তারা। তাই ভেবেছে, তোর একজন বন্ধু দরকার। তুই কি ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছিস? ওই যে জানলার ধারে বসে আছে?

– জি, দেখতে পেয়েছি। ছি ছি এমন মানুষও হতে পারে! ওদিকে তাকালেই বমি পায়।

কয়েকদিন পর অদ্ভুত রঙের ছেলেটা নিজ থেকেই এল। বন্ধুত্ব পাতাবে বলে। তাকে দেখেই একচোখা খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'কি চাই? এখানে কেন?

– আমার কোনো বন্ধু নেই! তাই তোমার কাছে এসেছি! কথা বলতে। দু'দণ্ড জিরিয়ে মনটা হালকা করতে।

– না না, আমার সঙ্গে ওসব হবে না। আমি পারব না। আমার কোন বন্ধুর প্রয়োজন নেই। তুমি যাও! আর কখনো এদিকে আসবে না।

– বড় আশা করে এসেছিলাম! ভেবেছিলাম তুমি অন্তত আমার দুঃখটা বুঝবে! এখন দেখছি এই পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই!

– তোমার সঙ্গে কোন মানুষ বন্ধুত্ব পাতাতে পারে! তোমাকে দেখলেই তো কেমন উদগার ওঠে!

– আচ্ছা, ঠিক আছে চলে যাচ্ছি!

এমনই হয়। আমাদের নিজেদের মধ্যেই অনেক দোষ বাসা বেঁধে আছে; অথচ অন্যদের মধ্যে সেসব দোষ দেখলেই আমরা তাকে আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। নিজের কথা বেমালুম ভুলেই যাই। নিজের গায়ের গন্ধ নাকে লাগে না। আল্লাহ আমাদেরকে দোষত্রুটি-সহই পৃথিবীতে অফুরন্ত রিযিক দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা অন্যের সামান্য দোষও সহ্য করতে রাজি নই। হজম করতে প্রস্তুত নই; অথচ একই দোষ আমার মধ্যেও বিদ্যমান।

মধ্যরাতের 'তরুণী'

টেলিফোনটা একনাগাড়ে বেজেই চলছে। ক্রিং ক্রিং! শায়খ ঘুমিয়ে আছেন। গভীর ঘুম। রীতিমতো নাকডাকার আওয়াজ বের হচ্ছে। দিনরাত ব্যস্ততা। টিভির প্রোগ্রাম। বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলের বয়ান। লেখালেখি। শিক্ষকতা। এতকিছু সামাল দিয়ে বিশ্রামের সময় বের করে আনা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার! ঘুমিয়েও শান্তি নেই! টেলিফোনের উৎপাত লেগেই আছে। বারবার নাম্বার বদলেও কাজ হয় না, কিভাবে যেন সবাই বের করে ফেলে।

ক্রমাগত আওয়াজে একসময় ঘুম ভাঙল। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। উরিব্বাস! সোয়া দুইটা! বিদেশ থেকে একটা অত্যন্ত জরুরী ফোন আসার কথা ছিল, সেটা নয় তো? তড়াক করে উঠে রিসিভার তুলে নিলেন। ঘুমজড়ানো গলায় বললেন,

– আসসালামু আলাইকুম!

ওপাশে কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি কেউ দুষ্টুমি করে ফোন করল! রিসিভার রেখে দিতে যাবেন, এমন সময় একটা মেয়েলি কণ্ঠ অত্যন্ত কোমল আওয়াজে বলল, 'আমি কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

শায়খ ভীষণ অবাক! চেনা নেই জানা নেই, তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে! তাও এই গভীর রাতে! রহস্যজনক!

– আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। পরিচয়টা একটু বলবেন?

– আমাকে আপনি চিনবেন না; কিন্তু আমি আপনাকে ভালোভাবে চিনি। আপনার টিভি প্রোগ্রামগুলো মাঝেমধ্যে দেখি!

– এত রাতে ফোন করার হেতু?

– আমার ঘুম আসছে না। আমার ইনসমনিয়া রোগ আছে। তাই রাতের বেলা কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারলে, মনে হয় মরে যাব।

– তা আমাকে কেন? নিজের নির্ঘুম রাতকে অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াটা যৌক্তিক আচরণ হতে পারে?

– জানি, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছি বলে আপনি রেগে গেছেন! দয়া করে ফোনটা রেখে দেবেন না। আমার কথাটা শেষ হোক।

— আপনার সময় থাকলেও, আমার সময় নেই! আগামীকাল আমার অনেক কাজ। রাতে ঠিকমতো না ঘুমুলে সমস্যা হতে পারে। কয়েকটা টিভিতে লাইভ প্রোগ্রাম করতে হবে।

— কিন্তু আমার যে আপনার সঙ্গে কথা বলা ভীষণ জরুরি! এই মুহূর্তে কথা বলার মতো আর কেউ যে নেই।

— আপনি যে অসুস্থের মতো কথা বলছেন, সেটা কি টের পাচ্ছেন? আপনার কথা বলার কেউ নেই, তাই বলে একজন বেগানা অপরিচিত মানুষকে কাঁচাঘুম থেকে জাগিয়ে কথা বলবেন?

— কেন আমি প্রতি রাতেই তো এমনটা করে থাকি।

— সেটা আবার কেমন?

— প্রতি রাতে পরিচিত ও অপরিচিত নাম্বারে ডায়াল করে কথা বলতে শুরু করি! একজন মেয়ে কথা বলতে চাইছে, এটা অধিকাংশ পুরুষই সামাল দিতে পারে না। ব্যগ্র হয়ে কথা বলতে শুরু করে! প্রথম মিনিটেই এমন ভাব করতে শুরু করে, তারা যেন আমার কতো দিনের আপন! আমার কতো হিতাকাঙ্ক্ষী! পারলে তখনই এসে আমার চোখের জল মুছে দেয়! এমনও হয়েছে, আমি গান শুনতে চাই বলার পর, জীবনে গানের 'গ'-শোনেনি, এমন ওস্তাদ মূর্খ খানও আমার কান ঝালাপালা করে দিয়ে কোলাব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ শুরু করে দেয়।

— আচ্ছা, কথা শেষ হয়েছে? আমি রাখছি তবে।

— না না, শায়খ! আরেকটু! আমি আসলে আপনাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম। আপনিও অন্যদের মতো কি না! একটু আগে কথা বলেছি সদ্য পরিচয় হওয়া এক বন্ধুর সাথে। বিকেলেই মার্কেটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কথা ও চেহারা ভালো লাগায়, আমিই যেচে তার নাম্বার নিয়েছি। সেও নিয়েছে। আমাদের বন্ধুমহলে এটা স্বাভাবিক।

— আচ্ছা, বুঝলাম। তা আমার সঙ্গে কী প্রয়োজন?

— আমি ওয়ালিদ মানে বিকেলে পরিচিত হওয়া ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছি। প্রায় পৌনে একঘণ্টা। ভেবেছিলাম তার মধ্যে সুন্দর ও নতুন কিছু আবিষ্কার করব। ও মা, সেও দেখি অন্যদের মতো! মেয়েদের প্রতি বুভুক্ষু নেকড়ে! কৃত্রিমভাষী! মুখ দিয়ে মধু ঝরে; অথচ অন্তরে একেকজন 'হিংস্র কুকুর'। তাদের সব কথা বের হয়ে, মুখ থেকে। মন থেকে একটা বাক্যও বের হয় না!

— অন্যকে গালি দেয়ার আগে নিজের অবস্থা যাচাই কোরো! তাদের কুকুর হয়ে ওঠার পেছনে তোমার ভূমিকা কতটুকু সেদিকেও তাকাও! একচোখা বিচার করতে যাচ্ছ কেন? এভাবে মাঝরাতে ফোন করলে, একজন খাঁটি ঈমানদার বান্দাও লোভী হয়ে উঠতে পারে।

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যেতে পারে। যাই হোক, আমাকে ফোন করার উদ্দেশ্যটা আমি এখনো বুঝতে পারিনি!

– আমি যতজনের সাথেই কথা বলেছি, সবাই-ই দ্বিতীয় দিন থেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে! তৃতীয় দিন থেকে ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করেছে, আমাকে ছাড়া সে বাঁচবে না!

– তোমার 'অশোভন' আচরণই তো তাকে এমনটা ভাবতে উৎসাহ যুগিয়েছে!

– জানি, তারা প্রত্যেকেই টেলিফোনে রেখেই আমাকে 'নোংরা' ভাষায় গালি দিয়েছে। আমার এক ফোনবন্ধুকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সে বলল, আগে দেখা-সাক্ষাৎ হোক। চেনাজানা হোক। তারপর বিয়ে। আজো বুঝিনি, সে চেনাজানা বলে কী বুঝিয়েছে? আমাদের মতো মেয়েরা আসলে কী চায় জানেন?

– কী চায়?

– তারা চায়, আপনাদের মতো মানুষের সান্নিধ্য। যারা আমাদের মতো মেয়েদের হাহাকার অন্তর দিয়ে অনুভব করবে। আমাদেরকে হেদায়াতের বাণী শোনাবে! ভিন্ন কোন 'ঈপ্সা' থাকবে না। সম্পূর্ণ আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্যেই তারা কাজটা করবে। যারা হবে আমাদের রহমদিল ভাই। ¯œেহাদ্র পিতা। নেককার স্বামী।

আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, আপনিও আমাকে একজন খারাপ মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছেন। ঠিকই তো, একজন ভালো মেয়ে কিভাবে গভীর রাতে ভালো ছেলে খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু চট করে একজনকে খারাপ বলে দেয়া সহজ নয়। তারা কতোটা দুঃসহ পথ মাড়িয়ে আজকের এই 'করুণ' অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সেটা কেউ তলিয়ে দেখতে যায় না।

– তুমি মানসিক যাতনায় ভুগছ। অস্থির হয়ে এখানে ওখানে শান্তি সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছ। কিন্তু এমনটা কেন হল?

– আমার বয়েস বিশ। এখনো পড়াশোনা শেষ হয়নি। আব্বু-আম্মু আছেন। তিন ভাই, তিন বোন। আব্বু একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ব্যবসাই তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-জপ। সেই সাত সকালে বেরিয়ে যান, গভীর রাতে ফেরেন। দুপুরে বা সন্ধ্যায় আব্বুকে বাসায় খুব কমই দেখেছি। বাসা আব্বুর কাছে স্রেফ রাতের খাবার আর ঘুমের জায়গা। ব্যাস, তিনি টাকা কামানোর একটি জীবন্ত মেশিন! বড় হওয়ার পর থেকে কখনো মনে পড়ে না, আমি আব্বুর সঙ্গে দুদণ্ড বসে কথা বলেছি! অথবা তিনি কখনো আমার কামরায় এসে বসেছেন। এমনটা আদৌ ঘটেনি। আমি পরিবারের সবচেয়ে ছোট হিসেবে, এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক! আমার বয়ঃসন্ধির বিপজ্জনক সময়ে আমি কতো কতো চেয়েছি, আব্বু

আমার সঙ্গে কথা বলুক। গল্প করুক। আমার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিন। কারণ আমি প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতায় ভুগতাম। একবার আব্বুকে বাসায় পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসেছিলাম! আমার মানসিক নিঃসঙ্গতার কথা তাকে বলতে গিয়েই কড়া ধমক খেতে হয়েছিল। রাগতদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,

– তোমাদের যা যা লাগে সবই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এরপরও তোমাদের প্যানপ্যানানি বন্ধ হবার নয়! আর কী চাও? আমাকে মেরে ফেলতে চাও? ঘরে বসে দুদ- জিরোব, সে উপায় নেই।

এ কথা বলে আব্বু গজগজ করতে করতে উঠে চলে গেলেন। আমার ভেতরটা ভীষণ শূন্য হয়ে গেল। হাহাকারে ভরে গেল আমার চারপাশটা! মনে হয়েছিল চিৎকার করে বলি,

– আব্বু, তোমার কাছে আমি খাবার চাই না। টাকা চাই না, গাড়ি চাই না, দামি পোশাক চাই না। আমি চাই তোমার আদর। তোমার একটুখানি ¯œেহ। সামান্য মনোযোগ। আমি যে বড্ড একা। ভীষণ নিঃসঙ্গ।

– কিন্তু তোমার আম্মু কোথায়?

– আম্মু অবশ্য আব্বুর মতো এতটা রূঢ় নন। তার আচরণ কিছুটা সদয়। কিন্তু হলে কী হবে, তিনিও বলতে গেলে ভোগসর্বস্ব মানুষ। তার কাছে জীবন হল খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো! ছেলেমেয়ে গড়ে তোলার দিকে তার থোড়াই মনোযোগ! তিনি বেশির ভাগ সময়ই এখানে সেখানে বেড়াতে যান। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতিথি হন। হাত খুলে খরচ করার সুবাদে সবাই তাকে পাশে পেতে চায়।

আব্বু বের হয়ে যাওয়ার পরপর তিনিও বের হয়ে যান। বিকেলে ফিরেই আমাদের সাথে, কাজের লোকদের সঙ্গে রাগারাগি শুরু করেন। পান থেকে চুন খসলেই সেরেছে! তিনি মনে করেন, এভাবে সবাইকে দৌড়ের ওপর রাখলে, তার অনুপস্থিতিজনিত সৃষ্ট সমস্যা কেটে যাবে। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলবে। নিজের দোষ ঢাকতে, তিনি সারাক্ষণই আমাদের দোষ খুঁজে বেড়ান। একটু এদিক-সেদিক হলেই আর রক্ষে নেই! অকথ্য ভাষার লাভা উদ্গীরণ শুরু হয়ে যায়। একটা কিছু হলেই তিনি তুলনা করতে শুরু করেন, তার অমুক বান্ধবীর মেয়ে কেমন! অমুক প্রতিবেশীর মেয়েটা কত্তো ভালো! লেখাপড়ায় কতো আগুয়ান! ঘরের কাজেকর্মে কতো চটপটে! রান্নাবান্নায় কী নিপুণ!

আমাদের নিয়ে বকাবকি শেষ করেই তিনি টিভি নিয়ে বসেন। রাজ্যের সব সিরিয়াল দেখেন।

– আপনার আব্বু-আম্মুর পরস্পরের সম্পর্ক কেমন?

– এককথায় বলতে গেলে, তারা দুজনের একজন আরেকজনের তোয়াক্কা করেন না। দুজনের মাঝে খুব একটা কথাবার্তা হতেও দেখা যায় না। যে যার মতো থাকেন! রাতে খাবার টেবিলেই শুধু সবাই একসাথ হয়, তাও বেশ কিছুদিন ধরে এটাও বন্ধ হয়ে আছে! যে যার মতো আসে যায়। আমাদের ঘরটাকে একটা হোটেল বললেই বেশি ভাল শোনায়!

– আপনার আম্মু বোধহয় সবসময় এমন ছিলেন না। আব্বুর কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে অথবা অন্য কোন কারণে এমন হয়ে গেছেন। আপনারও কি কর্তব্য ছিল না, আপনি নিজে যেচে গিয়ে কখনো মায়ের দুঃখটা বোঝার চেষ্টা করেছেন?

– আমি? আমি কেন তার দিকে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাব? তিনি এসেছেন আমার দিকে? আর তার দিকে যাওয়ার উপায় আছে? তিনি নিজের ও সন্তানদের মাঝে এমন এক অদৃশ্য দেয়াল তুলে রেখেছেন, অতিক্রম করা অসম্ভব। তিনি মনে করেন আমাদের সঙ্গে তার নৈকট্য তৈরি হলেই তার ইচ্ছেমত যেমন খুশি তেমন চলাফেরায় ছেদ পড়বে। এজন্য দিন দিন দেয়ালটাকে আরও বেশি দুর্লঙ্ঘ করে তুলছেন।

– তবুও আপনি মাকে দোষারোপ না করে, নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বরফের দেয়ালটা ভাঙতে অগ্রণী হলেন না কেন? আমার মতো বেগানা পুরুষের কাছে রাত-বিরেতে সান্তনা খোঁজার চেয়ে, নিজের জন্মদাত্রী মায়ের কাছে আশ্রয় খোঁজাই কি বেশি যুক্তিযুক্ত নয়?

– করিনি আবার! তিনি বাইর থেকে ঘরে এলে প্রথম প্রথম দৌড়ে ছুটে যেতাম। পাশে বসতাম। দুয়েকবার কেঁদেছিও। তিনি কেমনধরা দৃষ্টিতে তাকাতেন। যেন অদ্ভুত কোনো দৃশ্য দেখছেন! দুয়েকবার মাথায় হাত রেখেছেন। তারপর পরিচারিকাকে ডেকে বকাবকি করে তার কাছে সঁপে দিয়েছেন। সে ঠিকমতো আমাদের দেখাশোনা করছে না। উল্টো পরিচারিকা আমাদের প্রতি রুষ্ট হত। আম্মু তখন হয়তো টেলিফোন বা টিভি নিয়ে মশগুল হয়ে পড়তেন।

– আপনার অন্য ভাইবোন? তারা তো আপনার চেয়ে বড়।

– আমার বড় ভাইবোন একজন ছাড়া সবার বিয়ে হয়ে গেছে। তারা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তাদের কারো কাছে মনোবেদনার কথা খুলে বলার জো নেই। কিছু বলতে গেলেই তারা আব্বুর সুরে সুর মিলিয়ে বলে, তোর কোনো জিনিসটা কমতি আছে বল্‌তো!

আমার পিঠাপিঠি বড় ভাইয়ের এখনো বিয়ে হয়নি। সে আমার চেয়েও বেশি উ™ £ান্ত। কখন আসে কখন যায় টেরটিও পাওয়া ভার। লেখাপড়াতে ঠনঠন। বুঝ হওয়ার পর থেকেই সে পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের পাল্লায় পড়ে গেছে! এখনো তাদের সাথেই তার হরদম ওঠাবসা।

– শুনুন! আমি বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। আপনি এক কাজ করুন, একদিন সময় করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন। সে আপনাকে একটা সমাধান দেয়ার চেষ্টা করবে! আপনার সবকথাই সে এতক্ষণ ধরে শুনেছে! এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়ুন। আর হ্যাঁ, মানুষের কাছে আশ্রয় না খুঁজে মানুষের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করুন! প্রথম প্রথম ইচ্ছে না হলেও, জোর করে করে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিতে থাকুন। মনে করুন আপনি ওষুধ খাচ্ছেন।

একজন আরব শায়খের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া। আমাদের আধুনিক সমাজে এমন চিত্র খুব বিরল নয়। আকসার ঘটছে এসব ঘটনা। দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ।